মহিউদ্দিন মোহাম্মদ

মূর্তিভাঙা প্রকল্প

মূর্তিভাঙা প্রকল্প

মহিউদ্দিন মোহাম্মদ

জ্ঞানকোষ প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৪

মূর্তিভাঙা প্রকল্প
মহিউদ্দিন মোহাম্মদ

প্রকাশক
শাহীদ হাসান তরফদার
জ্ঞানকোষ প্রকাশনী
৩৮/২-ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১০৩৪৭
e-mail : gyankoshprokashoni@gmail.com

প্রচ্ছদ : সব্যসাচী মিস্ত্রী

মুদ্রণ : নোভা প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স
১৫/বি মিরপুর রোড, ঢাকা-১২০৫

মূল্য : ২৮০.০০ টাকা

MURTIBHANGA PROKALPA by Mohiuddin Mohammad
Published by Gyankosh Prokashoni
First Publication February 2024
Price : 280.00 Taka

ISBN : 978-984-98284-6-4

উৎসর্গ

ছমিরুদ্দিন
জয়ধনমালা
ও
মলাই মাস্টার।
তিনজনই মৃত।
তবে বই মৃত মানুষকেও জাগিয়ে তুলতে পারে।

প্রকাশকের কথা

এ বইয়ে লেখক যে-মূর্তি ভাঙতে চেয়েছেন, তা মাটি বা পাথরের তৈরি প্রতিমা নয়। বরং এ মূর্তি দীর্ঘদিন ধরে আমাদের মগজে লালিত বিভিন্ন অপধারণা। সম্প্রতি এক ঘটনায় মহিউদ্দিন মোহাম্মদ মন্তব্য করেছেনঃ

> "পড়া তিন প্রকার। রিডিং, মিসরিডিং, ও ইল-রিডিং। রিডিং মানে স্বাভাবিক পাঠ। লেখক যা বলতে চেয়েছেন, তা অবিকল সেই অর্থে অনুধাবন করা। মিসরিডিং হলো ভুল পাঠ, যেখানে পাঠক অথবা লেখক, যেকোনো একজনের, অথবা উভয় জনের, ভাষা ও বুদ্ধির সীমাবদ্ধতার কারণে ভুলভাবে কোনো লেখার পাঠোদ্ধার হয়। কিন্তু ইল-রিডিং হলো কূটপাঠ, যেখানে পাঠক ভালোভাবেই জানেন লেখক কী বলতে চেয়েছেন, তবুও নিজ স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে লেখাটির ভুল অর্থ সমাজে প্রচার করেন। মানুষকে ইল-রিডার বা কূটপাঠক হতে সাবধান থাকতে হবে।"

এ বইটি পড়ার সময় মিসরিডিং ঘটতে পারে। কেউ কেউ ঘটাতে পারেন ইল-রিডিং। সম্মানিত পাঠকগণ এ বিষয়ে সতর্ক থাকলে ভালো হয়। কারণ বইটিতে বিভিন্ন বিষয়ে স্পষ্ট ভাষায় কথা বলা হয়েছে।

'কর্ণফুলীর গান' নামে যে-অংশটি আছে, সেটি অনেকগুলো এফোরিজমের সমষ্টি। প্রতিটি এফোরিজম মানুষ ও সমাজের বিভিন্ন অসুখের দিকে ইঙ্গিত করেছে। কোনো কোনোটি আঘাত করেছে চিরায়ত নানা প্রথা ও নিয়মকে। 'লোকের জঙ্গল' রচনায় বিদ্রুপ করা হয়েছে প্রতিভাবান মানুষদের প্রতি প্রতিভাহীন ও মিডিওকার মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীকে। এটি অত্যন্ত উইটি ও উপভোগ্য রচনা। 'দর্শন কী?' অধ্যায়ে সাধারণ পাঠকের কাছে দর্শন বিষয়টির একটি প্রাঞ্জল পরিচয় উপস্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশের সমাজে দর্শন ও দার্শনিক সম্পর্কে যেসব বিভ্রান্তিকর ধারণা বিস্তার লাভ করেছে, সেগুলোর

প্রতি এ রচনাটি গুরুতর হুমকি। লেখকের দার্শনিক রচনাবলী পড়ার আগে 'দর্শন কী?' পড়া অপরিহার্য।

'পশু নয়, ফলমূল' অধ্যায়টি বৈপ্লবিক। এ অধ্যায়ে লেখক দেখিয়েছেন, কোরবানি আদায়ের জন্য পশু জবাই অপরিহার্য নয়। পশুর বদলে ফলমূল দিয়েও কোরবানি আদায় করা যায়। কোরবানির ধর্মীয়, রাজনীতিক, ও অর্থনীতিক দিকের পাশাপাশি তিনি এর দার্শনিক দিক নিয়েও আলোচনা করেছেন।

বইটির সব বক্তব্যের সাথে আমি একমত নই। এটি স্বাভাবিক। কারও সাথে সব বিষয়ে একমত হওয়া অসম্ভব। তবে ব্যক্তিগত বিশ্বাস এক পাশে রেখে বইটি পড়লে নানা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তার খোরাক পাওয়া যাবে। জ্ঞানের অগ্রগতির ক্ষেত্রে এই প্র্যাক্টিস জরুরি। আশা করবো বইটি পড়ে পাঠকের মনে চিন্তাভাবনার নতুন উন্মেষ ঘটবে।

মহিউদ্দিন মোহাম্মদের লেখাকে নতুন করে পরিচয় করানোর কিছু নেই। যারা জানেন, তারা জানেনই। তাঁর বহুল আলোচিত 'আধুনিক গরু-রচনা সমগ্র', 'ভোর হলো দোর খোলো খুকুমণি ওঠো রে', 'টয়োটা করোলা'– এসব বইয়ের তীরমাখা লেখা ও গল্প চিন্তাশীল পাঠক সমাজে সর্বজনবিদিত।

বইটিতে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি বিচ্যুতি থাকতে পারে। মুদ্রণ-বিভ্রাট এড়ানো খুব কঠিন। এরকম কিছু নজরে এলে তা আমাদের নজরে আনলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

শাহীদ হাসান তরফদার
জ্ঞানকোষ প্রকাশনী
জানুয়ারি, ২০২৪

লেখকের কথা

কাগজের মূল্য বেশি। তাই প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু লিখতে চাই না। মনের মতো একটি ‘লেখকের কথা’ যদি লিখি, তাহলে বেড়ে যাবে অনেক পৃষ্ঠা, যা আহত করবে পাঠককে। বাংলাদেশে বইয়ের পাঠকরা দরিদ্র, টাকা-পয়সা তাদের হাতে খুব একটা থাকে না। এমনিতেই বইয়ের চেয়ে সিগারেটের বিক্রি এখানে বেশি। একটি বার্গার ও একটি বই, এ দুটি বস্তু পাশাপাশি রাখলে, বার্গারটি নিয়েই বেশি কাড়াকাড়ি পড়বে। আমার ঘরে একবার চোর ঢুকেছিলো। দেখলাম, সে মোবাইল ফোন ও হাঁসের ডিম নিয়েছে, কিন্তু কোনো বই নেয় নি। বইয়ের দোকানেও শুনলাম বইয়ের চেয়ে চা-সিঙ্গারা বেশি বিক্রি হচ্ছে। কারণ বাঙালি বিশ্বাস করে– মন অনাহারে থাকলে অসুবিধা নেই, কিন্তু পেট অনাহারে থাকলে অসুবিধা আছে।

স্ত্রী ডক্টর শাহাম কাদিরকে কৃতজ্ঞতা জানানো দরকার। সে বিজ্ঞানী মানুষ। রাতদিন গবেষণা নিয়ে আছে। কাজ করে মার্কিন ফেডারেল ল্যাবে। তবে মাঝেমধ্যে জিগ্যেস করে– কী লেখো? আমি লেখা দেখাই। কিন্তু কোনো প্রশংসা পাই না। একদিন বললাম, দেখো, মৃণালিনী দেবীর কাছে রবীন্দ্রনাথও লোকাল কবি। তারপর থেকে আমার বইপত্র সে পড়া শুরু করেছে।

মহিউদ্দিন মোহাম্মদ

জানুয়ারি, ২০২৪

সূচি

কর্ণফুলীর গান

১.

মানুষের মুক্তি নিয়ে আমি উদ্বিগ্ন নই। আমি চেয়েছি মানসিকতার মুক্তি ঘটাতে। বদ্ধ মানসিকতাই মানুষকে শৃঙ্খলিত রাখে। মানুষ যেন তার বুদ্ধিকে আড়ষ্ট না করে, হুজুগের চেয়ে বিবেচনাবোধকে যেন সে বেশি প্রাধান্য দেয়– এমনটিই সর্বদা চেয়েছি। আমাদের শরীরের ডানা না থাকলেও মনের ডানা আছে। তরুণদের মনের পাখনা যেন সহজে বিকশিত হয়, বার্ধক্যের ছোবল যেন তারুণ্যকে গ্রাস না করে ফেলে– এ লক্ষ্যে কাজ করেছি। প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি, ও মতবাদের অন্ধ অনুসরণ নিরুৎসাহিত করেছি। মানুষ ইনফলাবল নয়। তার ত্রুটিবিচ্যুতি আছে। আমাদের যে-শারীরিক গঠন, তা মহাবিশ্বকে নির্ভুলভাবে জানার জন্য উপযুক্ত নয়। কোনো বিষয়েই 'সম্পূর্ণ জ্ঞান' অর্জনের সুযোগ আমাদের নেই। মানুষের সেনসেশন ও পার্সেপশন খুব একটা নির্ভরযোগ্য নয়। এ কারণে কোনো ব্যাপারে শতোভাগ নিশ্চিত হয়ে যাওয়াকে কখনো সমর্থন করি নি। সংস্কৃতি, ধর্ম, প্রথা, রাজনীতি, বিজ্ঞান– কোনোকিছুতেই মানুষের অনড় ও ডগম্যাটিক অবস্থানকে উৎসাহিত করি নি। অনড় থাকে পাহাড়, পর্বত, ও ভবন; মানুষ নয়। মানুষ সচল। যে-মানুষ কোনো বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছেন, তিনি বিকল গাড়ি মাত্র। ইট-পাথরের সাথে তার বিশেষ পার্থক্য নেই।

২.

প্রকৃতিতে ডোয়ার্ফিজম ও জাইগান্টিজম নামে দুটি ঘটনা ঘটে। ঘটনাগুলো এখানে একটু ব্যাখ্যা করছি:

বড় প্রাণীরা, যেমন হাতি, বাঘ, সিংহ, এরা যখন কোনো ছোট ও বিচ্ছিন্ন দ্বীপে বসবাস শুরু করে, তখন বংশপরম্পরায় এদের আকার ছোট হতে থাকে। তাদের শরীর, মগজ, সবই ধীরে ধীরে খর্বাকায় হয়। কারণ বড় শরীর ধারণের জন্য যে-পরিমাণ খাদ্য দরকার, তা ছোট দ্বীপ বা এলাকায় পাওয়া যায় না। ফলে টিকে থাকার তাগিদে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে, প্রাণীগুলোর আকার খর্ব হয়ে আসে, যেন কম খাবারে বেশিদিন বাঁচা যায়। বড় অতিকায় প্রাণী তখন পরিণত হয় বেঁটে জন্তুতে।

অন্যদিকে ছোট প্রাণীরা, যেমন ইঁদুর, ছুঁচো, টিকটিকি, এগুলো ওই পরিবেশে বংশ পরম্পরায় বড় হতে থাকে। কারণ ছোট দ্বীপে বড় প্রাণীর খাবার কম থাকলেও, ছোট প্রাণীর খাবার থাকে অঢেল। প্রিডেটর বা শিকারী প্রাণীর ভয়ও সেখানে কম। ফলে ছোট প্রাণীগুলো নির্ভয়ে প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণ করতে পারে। এতে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে, ছোট প্রাণী পরিণত হয় বড় প্রাণীতে।

উদাহরণ হিশেবে মাদাগাস্কার, সার্ডিনিয়া, ও মৌরিশাসের কথা বলা যায়। ওখানে ইঁদুর, টিকটিকি, কোমোডো, এসব প্রাণী দানবাকৃতির, কিন্তু হাতি, ছাগল, জলহস্তী, এগুলো খর্বাকৃতির।

এই যে কোনো এলাকায়, রসদের অভাবে বড় প্রাণীর ছোট হয়ে যাওয়া, এটি হলো ডোয়ার্ফিজম; আর রসদের প্রাচুর্যে, ছোট প্রাণীর বড় হয়ে যাওয়া, এটি হলো জাইগান্টিজম।

আমি ভেবে দেখেছি, ইভোলিউশোনারি বায়োলোজির এ চমৎকার ধারণাটি সংস্কৃতি, দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলা, এগুলোতেও প্রয়োগ করা যায়। গভীর চোখে তাকালে দেখতে পাই, জাইগান্টিজম ও ডোয়ার্ফিজম, প্রাণিজগতের মতো সমাজেও প্রতিদিন ঘটে চলছে।

কোনো এলাকায় মহৎ সাহিত্য, মহৎ দর্শন, মহৎ শিল্পকলা, মহৎ বৈজ্ঞানিক চিন্তা, উঁচু রাজনীতিক ভাবনা, এগুলোর গ্রাহক যদি কমে যায়, বা এপ্রিশিয়েশন উধাও হয়ে যায়, তাহলে ওই এলাকায় প্রতিভাবান মহৎ

মানুষের সংখ্যা, ধীরে ধীরে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে, কমতে থাকে। ফলে যা কিছু উঁচু ও মহৎ, তার আকার ও প্রভাব আস্তে আস্তে বেঁটে ও খর্বাকায় হতে শুরু করে। অর্থাৎ হাই-আর্ট ও হাই-কালচার পর্যবসিত হয় নিম্নমানের মেঠো-শিল্পকলা ও মেঠো-সংস্কৃতিতে। উঁচু সভ্যতা ক্ষয় হয়ে রূপ ধারণ করে বামন-সভ্যতার।

সংস্কৃতির রসদ ও খাদ্য মূলত সমাজের বাসিন্দারা। বাসিন্দাদের কর্মকাণ্ডেই সংস্কৃতি বেঁচে থাকে। তাদের রুচির ওপরই দর্শন, শিল্পকলা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, এগুলোর বিকাশ ও বিস্তার নির্ভর করে। উঁচু সাহিত্য, উঁচু দর্শন, উঁচু শিল্পকলার জন্য দায়ী মানুষের উঁচু রুচিবোধ। সমাজে মানুষের গড় রুচিবোধ নিচে নেমে গেলে, হাই-আর্ট ও হাই-থট এপ্রিশিয়েট করার মতো মগজ মানুষের মাথা থেকে হারিয়ে গেলে, সেখানে বিকাশ ঘটে বেঁটে সাহিত্য, বেঁটে দর্শন, বেঁটে বিজ্ঞান, ও বেঁটে শিল্পকলার। গৌণ বিষয়াদি তখন বিরাজ করতে থাকে মুখ্য রূপে। বেঁটে সংস্কৃতিরা পায় উঁচু সংস্কৃতির মর্যাদা।

সংস্কৃতি কী? লর্ড রাগলান বলতেন– মানুষ যা করে, আর বানর যা করে না, তাই সংস্কৃতি। কিন্তু বাংলাদেশে মনে হচ্ছে, বানরদের কাজকর্মই সংস্কৃতির প্রধান শাখা। লোকজন এখানে শরীর ধারণ করছে মানুষের, আর মন ধারণ করছে বানরের (বাস্তবের সুবোধ বানর নয়, কল্পনার নির্বোধ বানর; কারণ আমরা যা করছি, তা জঙ্গলের বানর করে না)। গোশালাকে বলা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়, স্ক্রিপচারকে ডাকছি বিজ্ঞান, পাগলামোকে বলছি রাজনীতি। অ্যারিস্টোটল এ সমাজে বড় হলে তাঁকে ডক্টর ইউনূসের বিরুদ্ধে বিবৃতি দিতে হতো। বার্ট্রান্ড রাসেলকে দেখা যেতো বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কোনো আহাম্মকী পদে। রবীন্দ্রনাথকে খাতির রাখতে হতো শাহবাগ থানার ওসির সাথে। অর্থাৎ কালচারাল ডোয়ার্ফিজম এখানে প্রকট। প্রতিভাবানরা টিকে থাকার তাগিদে প্রতিভা কমিয়ে ফেলছে। উঁচু সংস্কৃতি কদর হারিয়ে পরিণত হচ্ছে বেঁটে সংস্কৃতিতে। আর এই ফাঁকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে বিসিএস গাইড, স্পোকেন ইংলিশ, জায়েদ খান, হিরো আলম, আহমদুল্লাহ, আয়মান সাদিক, সেলেব্রিটিজম, মোটিভেশোনাল স্পিচ, বিটিএস, এসব। এ জঙ্গলে এগুলোই এখন মেইনস্ট্রিম জাইগান্টিক এনিম্যাল।

৩.

পৃথিবীতে একসময় 'বাবা'-র ধারণা ছিলো না। সন্তান জন্মদানে পুরুষের যে কোনো ভূমিকা থাকতে পারে, এ ব্যাপারটিই মানুষ জানতো না। মানুষের সভ্যতা মূলত মায়ের সভ্যতা। ট্রোবিয়ান্ডরা ভাবতো, মেয়েদের ভেতর 'ব্যালোমা' নামক ভূত ঢোকার কারণে সন্তান জন্ম হয়। ব্যালোমাটা কখন ঢোকে? যখন মেয়েরা একটু গভীর পানিতে গোসল করতে নামে, তখন। কোনো মেয়ে যদি বলতো, আমাকে মাছে কামড়িয়েছে, তাহলে সমাজ ধরে নিতো, তার ভেতর ব্যালোমা ঢুকেছে; কিছুদিনের মধ্যেই পেট ফুলে উঠবে। কিন্তু ব্যালোমা কেবল ওই মেয়েদের পেটেই সহজে ঢুকতো, যাদের সাথে ছেলেদের ঘনিষ্ঠ মেলামেশা থাকতো। মালিনোস্কি যখন অবিবাহিত এক মেয়ের ঘরে বাচ্চা দেখে জিগ্যেস করেছিলেন, শিশুটির বাবা কে? তখন ট্রোবিয়ান্ডরা প্রশ্নটি বুঝতে পারে নি। তবে বুঝিয়ে বলার পর উত্তর এসেছিলো, বাচ্চা হওয়ার জন্য তো বাবার প্রয়োজন নেই। বাচ্চা দিয়েছে ব্যালোমা। মেলানেশিয়ানরা বলতো, বিবাহিতদের বাচ্চা স্বামীর কারণে হলেও অবিবাহিতদের বাচ্চা হয় খাবারের কারণে। কিছু নির্দিষ্ট খাবার খেলে মেয়েরা গর্ভবতী হয়। অর্থাৎ স্বামীর যে-গুরুত্ব বর্তমান সমাজে আছে, তা মানুষের সমাজে দীর্ঘকাল ছিলো না। এমনকি স্বামী-স্ত্রী একসাথেও থাকতো না। অনেকেই বিয়ের পর নিজ নিজ মায়ের সাথে থাকতো। সন্তান ছিলো এক্সক্লুসিভলি মায়ের সম্পত্তি। তোমার বাবা কে, এ প্রশ্ন মানুষ করতো না। বহু স্বামী তার স্ত্রীর সাথে লুকিয়ে মেলামেশা করতো। পরিবার ছিলো মা ও ভাইকেন্দ্রিক। স্বামী-স্ত্রীর বন্ধনের চাইতে ভাই-বোনের বন্ধন অধিক শক্তিশালী ছিলো। সন্তানের উপরও স্বামীর চেয়ে ভাইয়ের কর্তৃত্ব বেশি থাকতো। দারিয়াস যখন ইন্তাফার্নেসের পরিবারকে হত্যা করার উদ্যোগ নিয়েছিলো, তখন ইন্তাফার্নেসের বউ স্বামীকে না বাঁচিয়ে ভাইকে বাঁচিয়েছিলো। সে দারিয়াসকে বলেছিলো, স্বামী মারা গেলে স্বামী পাবো, সন্তান মারা গেলে সন্তানও পাবো, কিন্তু ভাই মারা গেলে ভাই পাবো না। প্রাচীন সাহিত্যকর্মেও এর নজির আছে। অ্যান্টিগানি তার ভাইয়ের টানেই মৃত্যুবরণ করেছিলো, স্বামীর টানে নয়। স্বামী পলিয়াসের চেয়ে ভাই পলিনিসিস তার কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। খ্রিস্টান মিশনারিরা যখন মেলানেশিয়ায় ধর্ম প্রচারের জন্য গিয়ে বলেছিলো, ঈশ্বর হলেন যিশুর বাবা, তখন কথাটি কেউ বুঝে নি। কিন্তু যখন বলা হলো,

ঈশ্বর হলেন যিশুর মামা, তখন সবাই বিষয়টি বুঝে ফেললো। অর্থাৎ পিতৃত্ব ও স্বামীত্বের যে-বড়াই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলোতে আছে, তা খুব রিসেন্ট ইনভেনশন। হাজার হাজার বছর ধরে নারীরা স্বামীর কর্তৃত্ব ছাড়াই পৃথিবী দাপিয়ে বেড়িয়েছে।

আমি বলছি না যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক গুরুত্বহীন হয়ে পড়ুক, বা স্ত্রীরা স্বামীদের যন্ত্রণা দিক, বরং আমার চাওয়া হলো– স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যেন জোর-জবরদস্তিমূলক না হয়। কাবিনের চেয়ে ভালোবাসা যেন মুখ্য হয়ে ওঠে। পদে পদে স্ত্রীকে স্বামীর অনুমতি নিতে হবে, বা স্বামীকে মিনিটে মিনিটে স্ত্রীর কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে, এ ধরনের কর্তৃত্ববাদী সম্পর্ক আমার চাওয়া নয়। আমি চাই, স্বামী-স্ত্রী নিজেকে এক দেহ এক মন ভাবুক। একের জিনিস অন্যকে বিলিয়ে দিক। আদেশ, নিষেধ, চালতার দোহাই, তিতা করল্লার দোহাই, এসব দিয়ে যেন একে অন্যের জীবন তারা অতিষ্ঠ না করে।

৪.

যে-বুদ্ধিজীবী জনগণের কাছে প্রিয়, তাকে সন্দেহের চোখে দেখতে হবে। জনগণকে মুগ্ধ করা, জনগণের সমীহ আদায় করা, এগুলো বুদ্ধিজীবীর কাজ নয়। এগুলো যাদুকর, পীর-দরবেশ, ও পুঁথিজীবীর কাজ। এ দেশে দুই ধরনের লোককে বুদ্ধিজীবী বলা হয়। এক– যিনি জনগণের মগজ খেয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। দুই– জনগণ যার মগজ খেয়ে সুখনিদ্রা যায়। কিন্তু যিনি মগজ সৃষ্টি করেন, নষ্ট মগজ মেরামত করেন, বা সমাজের ময়লায় ঢেলে দেন অবলীলায় সাবান, তাকে এ অঞ্চলে বুদ্ধিজীবী ডাকা হয় না। বুদ্ধিজীবী এখানে তিনি, যিনি জনগণ যা শুনতে চায় তা শোনাতে পারেন। জনগণ যা দেখতে চায়, তা দেখাতে পারেন। যা বললে জনগণের ঘুম ভেঙে যায়, যা উচ্চারণ করলে কেঁপে ওঠে স্থিতাবস্থা, তা মুখে আনা থেকে বিরত থাকাই বুদ্ধিজীবিতা। অর্থাৎ জনতা মনে করে– বুদ্ধিজীবী একপ্রকার ঘুমের বড়ি, যার কাজ সারাক্ষণ নির্বোধদের মাথায় পালক বুলিয়ে দেয়া।

৫.

জ্ঞানচর্চায় ধারাবাহিকতা থাকতে হয়। অন্যথায় অজ্ঞতা দ্রতই দখল করে জ্ঞানের স্থান। একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি স্পষ্ট হবে। মুসলিমরা যখন সমরখন্দ জয় করে (৭১২ সাল), তখন চাইনিজদের কাছ থেকে তারা কাগজ বানানোর কৌশল শিখেছিলো। এ কৌশল ব্যবহার করে বাগদাদে স্থাপন করা হয়েছিলো কাগজ কারখানা (৭৯৪ সাল)। কে করেছিলো? আল-ফজল (খলিফা হারুনের উজিরের ছেলে)। এই কাগজ বানানোর কৌশল, মুসলিমরা ধীরে ধীরে স্পেন, সিসিলি, ইতালি, ও ফ্রান্সে ছড়ায়। তার আগে ইউরোপে কাগজ ছিলো না। অর্থাৎ বই বলতে এখন আমরা যা বুঝি, তা মুসলিমরা যাওয়ার আগে ওখানে ছিলো না। যদি কাগজ প্রচলের ইতিহাসের দিকে তাকাই, তাহলে দেখবো– চীনে তা শুরু হয়েছিলো ১০৫ সালে, মক্কায় ৭০৭ সালে, মিশরে ৮০০ সালে, স্পেনে ৯৫০ সালে, কনস্টানটিনোপলে ১১০০ সালে, সিসিলিতে ১১০২ সালে, ইতালিতে ১১৫৪ সালে, জার্মানিতে ১২২৮ সালে, এবং ইংল্যান্ডে মাত্র ১৩০৯ সালে।

এই যে সময়, এ সময়ে মুসলিম বিশ্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশ্ব ছিলো। প্রতিটি মুসলিম শহর ছিলো বইপত্রের শহর। আমি আল-ইয়াকুবির একটি বইয়ে দেখলাম, তাঁর সময়ে, অর্থাৎ ৮৯০-৯৫ সালের দিকে, বাগদাদে একশোর বেশি বইয়ের দোকান ছিলো। হাতে লিখে বই কপি করা, এটা ছিলো খুব জনপ্রিয় পেশা। ছাত্রদের অধিকাংশই এ কাজ করতো। এতে হতো কী, বই কপি করার সময় বইটা পড়াও হয়ে যেতো। ধনী মুসলিমদের প্রধান শখই ছিলো বই সংগ্রহ করা। এখন তো লেখকরা রয়ালটি পান, কয়েক লাখ টাকা এ বছর আমিও পেয়েছি, কিন্তু তখন রয়ালটি প্রথা ছিলো না। লেখকদের ভরণ-পোষনের দায়িত্ব নিতো বিত্তবানরা। প্রতিটি মসজিদে লাইব্রেরি থাকতো, এবং এসব লাইব্রেরিতে কেবল ধর্মীয় বই থাকতো না। বরং ধর্মীয় বই সবচেয়ে কম থাকতো, বেশি থাকতো দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, চিকিৎসাবিদ্যা, এসবের বই। শহরগুলোতে বাসিন্দারা চাঁদা তুলে লাইব্রেরি বানাতো। পাবলিক লাইব্রেরি। মসুলে ৯৫০ সালের দিকে একটি লাইব্রেরি ছিলো, যেটি ছাত্রদেরকে শুধু বই পড়তে দিতো না, বই লেখার জন্য বিনামূল্যে কাগজও সরবরাহ করতো। রাই শহরে যে-পাবলিক লাইব্রেরিটি ছিলো, সেটিতে এতো পরিমাণ বই ছিলো যে, বইয়ের তালিকা

করার জন্যও দশটি বইয়ের সমান কাগজ লাগতো। বসরা শহরের লাইব্রেরিগুলোয় যারা পড়তে যেতো, তারা মাসিক বৃত্তি পেতো। ইয়াকুত শিহাব একটি জিওগ্রাফিক্যাল ডিকশোনারি লিখেছিলেন, মুজাম উল-বুলদান নামে, সেটির তথ্য সংগ্রহ করার জন্য তিনি কয়ে বছর বিভিন্ন লাইব্রেরিতে ঘোরাঘুরি করেছিলেন, এবং এসব লাইব্রেরি মুসলিমদেরই প্রতিষ্ঠা করা ছিলো। মোঙ্গলরা যখন বাগদাদ আক্রমণ করে, তখন সেখানে ৩৬টির মতো গণগ্রন্থাগার ছিলো। ব্যক্তিগত লাইব্রেরি ছিলো অসংখ্য। এক ধনী আরেক ধনীর সাথে বই সংগ্রহের প্রতিযোগিতা করতো। বুখারার সুলতান একবার এক চিকিৎসককে তাঁর প্রাসাদে বাস করার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু ওই চিকিৎসক রাজি হন নি, কারণ তার সংগ্রহে এতো পরিমাণ বই ছিলো যে, সেগুলো প্রাসাদে নিতে প্রায় ৪০০ উটের দরকার ছিলো। আল-ওয়াকিদি যখন মারা যান, তখন তাঁর ঘরে ৬০০ বাকসো বই পাওয়া গিয়েছিলো। ছোট বাকসো নয়, বড় বাকসো। প্রতিটি বাকসো এতো ভারি ছিলো যে, তা উঠাতে দুইজন লোক লাগতো। শুধু শাহিব ইবনে আব্বাসের ঘরে যে-পরিমাণ বই ছিলো, সে-পরিমাণ বই পুরো ইউরোপেও ছিলো না। রাস্তায় বের হলেই জ্ঞান সন্ধানী মুসাফিরের দেখা মিলতো। মসজিদগুলো যতোটা না নামাজের স্থান ছিলো, তার চেয়ে বেশি ছিলো বিদ্যালয় ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। মসজিদে ঢুকলেই কোনো না কোনো এলাকার ভূগোলবিদ, চিকিৎসক, কবি, থিওলোজিয়ান, তাদের দেখা মিলতো। দার্শনিক বিতর্ক ছিলো খুবই জনপ্রিয়। কেউ ধনী, কিন্তু শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করে নি, এমনটি মুসলিম সমাজে দেখা যেতো না।

৬.

পরীক্ষার হলে বই ও নকল নিতে দেয়া দরকার। শুধু বই নয়, ইন্টারনেট সংযোগসহ মোবাইল ফোনও নিতে দেয়া উচিত। কারণ সমাজে মানুষ এগুলো সাথে নিয়েই জীবন যাপন করে। কোনো উদ্ভূত সমস্যায় মানুষ তার হাতে থাকা সকল রসদ ব্যবহার করতে চায়, যদি এগুলোর সঠিক ব্যবহার সে জানে। ছাত্ররা যেন প্রয়োজনীয় এপারেটাস কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে শেখে, এটি নিশ্চিত করাই শিক্ষার বড় কাজ। বই,

কম্পিউটার, ইন্টারনেট, সার্চ ইঞ্জিন, এগুলো আধুনিক সমাজের খুব জরুরি রসদ। যে-তথ্য বই ও এনসাইক্লোপিডিয়ায় সহজলভ্য, তা মুখস্থ করে মাথা ভারি করার প্রয়োজন নেই। মাথা ব্যবহৃত হওয়া উচিত তথ্য ও জ্ঞানকে কীভাবে সমস্যা সমাধানে ব্যবহার করা যায়, কোনো বিষয়ে কীভাবে আর্গুমেন্ট ডেভেলাপ করা যায়, প্রতিষ্ঠিত মতামতকে কী প্রক্রিয়ায় চ্যালেঞ্জ জানানো যায়, এ কাজে। কোনো বই মনোযোগ দিয়ে পড়লে, কিছু তথ্য এমনিতেই স্মৃতিতে গেঁথে যায়। এসব তথ্য আমাদেরকে জানায়, বইটির কোন অংশে কী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, বা কোন পাতায় কী আছে, তা। ফলে প্রয়োজনের সময়, এসব তথ্যের সূত্র ধরে বইটিতে আমরা অন্যান্য দরকারি তথ্য তালাশ করতে পারি। বই ও গুগল ঘেঁটে সঠিক তথ্য বের করা, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা। এ দক্ষতা যার আছে, সে-ই ভালো ছাত্র। এ জন্য প্রশ্নপত্র তৈরি করা উচিত এমনভাবে, যেন ছাত্ররা পরীক্ষার হলে বই ও স্মৃতি ঘেঁটে, প্রয়োজনীয় তথ্য বের করে সমস্যা সমাধান করতে পারে, বা কোনো বিষয়ে চিন্তাবহুল আলোচনার জন্ম দিতে পারে। প্রশিক্ষিত পাখির মতো তথ্য উগড়ে দেয়া, বা পাগলের মতো স্মৃতি হাতড়ে বেড়ানো, এগুলো জ্ঞানচর্চা নয়। এগুলো তথ্যচর্চা। একপ্রকার স্মৃতিবিলাস।

ছাত্রদেরকে পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহের সুযোগ দিয়ে বলতে হবে, তুমি সমস্যাটি সমাধান করো, বা ওই বিষয়ে আলোচনা করো। যে-ছেলে গণিত জানে, গণিতের সূত্রগুলোর উৎস বোঝে, সে-ছেলে গাণিতিক সূত্রাবলী মুখস্থ করে পরীক্ষার হলে যাবে, এমন কাজ বর্বরতা। বরং সূত্র ও তথ্য হাতের কাছে রাখা, এবং তা ব্যবহার করে সমস্যা সমাধান করা, এটিই সভ্যতা।

৭.

আমি শিশুদের সাথে সময় কাটাতে পছন্দ করি, কারণ শিশুদের তাড়াহুড়ো কম। তারা সম্পত্তি বা প্রপার্টি ধারণার সাথে পরিচিত নয়। একটি লেবেনচুষ শিশুরা অনায়াসে পাঁচশো টাকা দিয়ে কিনে ফেলতে পারে। কিন্তু আমি পারি না। তাদের মুগ্ধ হওয়ার ক্ষমতা আছে, যা আমার নেই। একটি ফড়িঙের দিকে ওরা যে-দৃষ্টিতে তাকায়, সে-দৃষ্টিতে আমি তাকাতে পারি

না। সামান্য দুঃখে তারা মায়ের কোলকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। অবলীলায় উচ্চারণ করতে পারে সত্য। ওদের তো লুকোবার মতো কিছু নেই। ঘুমের জন্য তাদেরকে দুশ্চিন্তা করতে হয় না। কোনো শিশু ঘুমের ওষুধ খরিদ করেছে, এমনটি কখনো শুনি নি। তবে 'সময়' নামক শিশুনাশক পান করার কারণে মানুষ বেশিদিন শিশু থাকতে পারে না। যেটিকে আমরা বড় হওয়া বলি, সেটি আসলে শিশুহত্যার শোক প্রকাশের ক্ষমতা। শৈশব হারানোর পর মানুষ রোজ একধরনের সেল্ফ-কিলিংয়ের মধ্য দিয়ে যায়। এই সেল্ফ-কিলিংকেই তারা বলে বেঁচে থাকা। কেউ বেঁচে আছে, এর অর্থ হলো– সে নিজেকে একটু একটু করে হত্যা করতে পারছে।

৮.

একদিন এক বাড়িতে ঢুকে দেখি, দুটি শিশুকে খুব পেটানো হচ্ছে। তাদের হাতের লেখা নাকি সুন্দর না। আমি লাঠিওয়ালাকে বললাম, 'বাচ্চা দুটির চিন্তা সুন্দর কি না– তা কখনো যাচাই করেছেন?' ভদ্রলোক কোনো জবাব দিলেন না। তবে লোকটির ভেতরে থাকা অন্ধকারগুলো উত্তর দিলো– 'মাথার লেখার চেয়ে হাতের লেখাই এ দেশে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'

৯.

সক্রেটিসের সব চিন্তা শুভ নয়। তিনি আইনের অসীম ক্ষমতায় বিশ্বাস করতেন। নিয়ম-শৃঙ্খলা ছিলো তাঁর ঈশ্বর। তিনি বলতেন, শৃঙ্খলার স্বার্থে রাষ্ট্রের অন্যায় বিচারও মেনে নিতে হবে। রাষ্ট্র নিপীড়ন করলে কোনো প্রতিবাদ করা যাবে না। রাষ্ট্র ও আইন যে স্বৈরাচারী হওয়ার শক্তি রাখে, দুর্বল ও ভিন্নমতাবলম্বীর ওপর যে এটি খড়্গহস্ত হতে পারে, এ ব্যাপারে তিনি উদাসীন ছিলেন। আইনের পীড়নকে সমর্থন করতেন অন্ধের মতো। শাসন ও পীড়নের মাঝে তিনি পার্থক্য করতে পারতেন না। 'আনজাস্ট স্ট্যাটাস কো' বা নিপীড়নমূলক স্থিতাবস্থার সাথে অনেকটাই তাল মিলিয়ে চলতেন। তাঁকে যখন মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়, তখনও তিনি এথেনীয় লিগাল-

সিস্টেমের অনুগত শাবক ছিলেন। বাস্তবতা আর পরিস্থিতি মূল্যায়নে তাঁর উদাসীনতা লক্ষণীয়। বিচারকার্যে নিজেকে ডিফেন্ড করার চেয়ে দার্শনিক তর্কাতর্কিতেই অধিক সময় ব্যয় করেছিলেন। বিচারকদের সাথে, যারা দর্শন ও জ্ঞানচর্চায় ছিলেন প্রায় নির্বোধ, লিপ্ত হয়েছিলেন ফিলোসোফিক্যাল ডিবেটে। অধিকার ও স্বাধীনতা, এ বিষয়গুলো সম্পর্কেও তাঁর পরিষ্কার ধারণা ছিলো না। রাষ্ট্র ও আইন কর্তৃক নাগরিকরা অন্যায়ের শিকার হলে, তা চোখ বুজে সহ্য করতে হবে, এই ছিলো সক্রেটিসের মনোভাব। তাঁকে মৃত্যু এড়ানোর সুযোগ দেয়া হলেও, তিনি তা এড়ান নি। আমিই সঠিক, আমার কথাই চূড়ান্ত সত্য, এমন একটি হাবভাব তাঁর ভেতর ছিলো। অর্থাৎ ভদ্রলোক ছিলেন একপ্রকার নীতিবাদী গোঁয়ার। আমি তাঁর রাজনীতিক দর্শনকে মাত্র একটি বাক্যে সামারাইজ করতে পারি। সেটা হলো– আইন ও বিচার, তা যতো নিবর্তনমূলকই হোক, এটিকে হাসিমুখে মেনে নিতে হবে। পৃথিবীর সৌভাগ্য যে, মানুষ সক্রেটিসের নাম জানলেও তাঁর রাজনীতিক দর্শন সম্পর্কে তেমন কিছু জানে না। জানলে, আধুনিক স্তালিনগণ নতুন জীবনীশক্তি পেতো।

১০.

এ দেশে সাহিত্যিকদের ভাবমূর্তি পত্রিকা-নির্ভর। পত্রিকা যদি বলে, আব্দুল আলি মহান সাহিত্যিক, তাহলে পত্রিকার উম্মতেরাও বলতে শুরু করবে– আব্দুল আলি মহান সাহিত্যিক। মিডিয়া আমাদের চিন্তা নিয়ন্ত্রণ করছে। কোনো বিষয়ে মিডিয়া যে-ন্যারেটিভ তৈরি করে, তার বাইরে যাওয়ার সাধ্য খুব কম মানুষেরই আছে। অন্ধকারে সব রঙই কালো দেখায়। মিডিয়া মানুষের জন্য কৃত্রিম অন্ধকার তৈরি করছে। এ অন্ধকারে সাদাকেও কালো হিশেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। ফলে মানুষ সহজে সত্যের দেখা পাচ্ছে না। শিশুরা একবার মিথ্যাকে সত্য হিশেবে গ্রহণ করে ফেললে, তার প্রভাব বৃদ্ধকালেও থাকে। বহু গুণী মানুষ মিডিয়ার আঘাতে ইতিহাস থেকে বিলীন হয়ে গেছেন। তাঁদের কথা এখন আর কেউ বলে না। আমাদের ছেলেমেয়েরা কি লালবিহারী দে'র কথা জানে? জানে না। কারণ কোনো মিডিয়া বা টকশোওয়ালা তাঁর কথা প্রচার করে নি। অথচ স্বয়ং ডারউইন তাঁর বই 'দি হিস্ট্রি অব আ বেঙ্গল রাইয়াত'-এর প্রশংসা করেছিলেন।

নূরন্নেছা খাতুনের কথাও বলতে পারি। প্রায় একশো বছর আগে এই ভদ্রমহিলা ‘স্বপ্নদ্রষ্টা’, ‘আত্মদান’, ‘ভাগ্যচক্র’, ‘বিধিলিপি’, ‘নিয়তি’, ও ‘জানকী বাঈ’-এর মতো উপন্যাস ও আখ্যান রচনা করেছিলেন। তিনি সে-সময়েই আজকের ভুঁইফোঁড় অপন্যাসিকদের চেয়ে কয়েকশো বছর এগিয়ে ছিলেন। কিন্তু মিডিয়ার কাছে নূরন্নেছা খাতুনের চেয়ে সভাপতি হোসেনরা অধিক গুরুত্বপূর্ণ! আমার মনে হয় না ফেসবুকবাসী নূরন্নেছা খাতুনের কথা জানে। এর মানে কী দাঁড়ালো? এর অর্থ হলো– মিডিয়ায় উচ্চারিত নাম ছাড়া আর কাউকে না চেনার একটি প্রবণতা বাংলাদেশে তৈরি হয়েছে। এটি শিল্প-সাহিত্যের জন্য ক্ষতিকর। মাদার হক, প্লানচেট আহমেদ, এই লেখকগুলো মিডিয়ার সৃষ্টি। বাজারে ভালো খাবার ছিলো না, এই সুযোগে ‘সামান্য ভালো’-কে মিডিয়া ও গণবাহিনী মিলে ‘কিংবদন্তী’ বানানোর প্রয়াস নিয়েছে। মিডিয়ার মিডিওকার ছদ্মপণ্ডিতদের প্রতাপে গণমনেও এসব নাম দেবতার আসনে বসতে শুরু করেছে। ঘটছে প্রোফেটাইজেশন বা নবীকরণ। নবীকরণের বিরুদ্ধে কথা বলা আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। এ কথা ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়। বরং ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা প্রোফেটাইজেশনের বিরুদ্ধে। চোখের সামনে কারও মিথ্যা ভাবমূর্তি তো আমি তৈরি হতে দিতে পারি না।

অনেকে বলেন, আপনি এক কথায় ‘বাতিল’ করে দিচ্ছেন। দুই বাক্যে ‘খারিজ’ করে দিচ্ছেন। খুবই উদ্ভট অভিযোগ। কারণ, অন্যরা কাউকে ‘গ্রহণ’ করতে যদি এক হাজার বাক্য ব্যয় না করে, তাহলে আমি তাকে ‘বাতিল’ করতে একশো বাক্য ব্যয় করবো কেন? ব্যাপারটা অনেকটা এরকম: প্রশংসা বা ভক্তি করতে কারণ দর্শানোর প্রয়োজন নেই, কিন্তু খারিজ করতে কারণ দর্শাতে হবে! এটি কি রেসিপ্রোকাল আবদার হলো? প্রায়ই দেখি, ছাপা হচ্ছে– অমুক বিরাট ঔপন্যাসিক, তমুক বিকট গল্পকার, সমুক মহান দার্শনিক, ছমুক ছায়াপথের শ্রেষ্ঠ কবি, কিন্তু কেন তিনি বিরাট ঔপন্যাসিক, বিকট গল্পকার, শ্রেষ্ঠ কবি, ও মহান দার্শনিক, এ ব্যাপারে কোনো আলোচনা নেই। মিডিয়া প্রচার করছে, গণবাহিনী বলছে, তাই আমাকেও বলতে হবে; এই হলো অবস্থা। এগুলো একপ্রকার আত্মপ্রতারণা। পচা মাছ শনাক্ত করার জন্য যেমন আমরা মাছের পেট কাটি না, একটি গুঁতো দিয়েই বুঝে যাই, তেমনি কেউ মহৎ সাহিত্যিক কি না, এটিও তার রচনাবলিতে এক ঘণ্টা চোখ বুলালেই অনুভব করা যায়।

১১.

ফ্রিজের কেনাবেচা নিয়ন্ত্রিত হওয়া দরকার। ফ্রিজ মানুষকে অতিরিক্ত কেনাকাটায় উদ্বুদ্ধ করছে। প্রয়োজনীয় নয়, এমন অনেক খাদ্য ফ্রিজের কারণে বিক্রি হচ্ছে। ফ্রিজ কাজ করছে পুঁজিবাদী ফাঁদের মতো। একদিনে অনেকদিনের বাজার করা, এ ব্যাপারটি মানুষকে নিশ্চল করে তোলে। তার স্বাভাবিক হাঁটাচলা কমে যায়। তাজা মাছ, তাজা সবজি, এগুলো রান্নাঘরে ধীরে ধীরে অপরিচিত হয়ে উঠছে। ফ্রিজ সহজলভ্য হওয়ার আগে সমাজে এতো মেদ-ভুঁড়ি ছিলো না। ফ্রিজের প্রাদুর্ভাবে মানুষ আটকা পড়েছে অনেকগুলো মিসম্যাচ রোগের ফাঁদে। কারণ ফ্রিজের কারণে সে চাইলেই ঘরে বসে এটা সেটা খেতে পারে। জমিয়ে রাখতে পারে হাই-ক্যালোরি ড্রিংক্স, প্রসেসড জুস, ও মিষ্টান্ন। কোরবানির মাংস ফ্রিজে থেকে থেকে শুঁটকি হচ্ছে। এসব প্রয়োজনীয় খাবার নয়। অতিরিক্ত খাবার। যা ফ্যাট ও ট্রাইগ্লিসারাইড রূপে জমা হচ্ছে শরীরে। ব্লাড স্ট্রিমে সর্বদা বিরাজ করছে অতিরিক্ত শর্করা। ফলে ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, ও স্ট্রোকের ঝুঁকি বেড়ে যাচ্ছে বহুগুণ। আগে খাবার বেশি রান্না হলে আমরা গরিব-গোরাকে দিয়ে দিতাম, কিন্তু এখন তা ঢুকিয়ে রাখছি ফ্রিজে। ফ্রিজ হতে সাবধান।

১২.

'বুরকা' ও 'হিজাব'– এ দুটি বিষয়কে মুসলিমরা প্রায়ই গুলিয়ে ফেলে। মনে করে, হিজাব মানেই বুরকা। আসলে তা নয়। বুরকা হলো কোনো বিশেষ কারণে মাথা ও মুখ ঢেকে চলাফেরার পোশাক। বুরকার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। পৃথিবীতে ইসলাম আসার বহু আগে থেকেই বুরকা ছিলো। আরব পৌত্তলিকদের একটি অংশ বুরকা পরতো। বাইজেন্টিন নারীরাও বুরকা পরতো। সেদিক থেকে বুরকা মূলত অমুসলিমদের পোশাক।

বুরকা প্রধানত পরা হতো– (ক) তীব্র রোদ ও বৈরি আবহাওয়া থেকে রক্ষা পেতে; (খ) গুপ্তচরবৃত্তি, চৌর্যবৃত্তি, ও চোরাকারবারের সহায়ক পরিধেয় হিশেবে; (গ) সম্মানজনক নয়, এমন পেশায় নিয়োজিত নারীদের রক্ষাকবচ হিশেবে; (ঘ) হারেমখানায় স্ত্রীর মর্যাদা পান নি, এমন নারী ও যৌনদাসীদের পরিচয় আড়ালকারক হিশেবে; এবং (ঙ) নেকাব দ্বারা চোখের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে (কারণ আরব নারীদের চোখ সুন্দর ছিলো।

তবে বুরকা শুধু মাথা বা মুখের হয় না। পায়েরও হয়। যেমন চীনা নারীরা পা দেখাতে চায় না। তাদের জন্য জুতা একপ্রকার বুরকা।

ইসলামের শুরুর দিকে 'হিজাব' বা 'পর্দা' বলতে আড়ালকারক চাদর ও দেয়াল বুঝাতো। তখন বহুকক্ষবিশিষ্ট ঘর-বাড়ি আরবে ছিলো না। মসজিদে এতেকাফের সময় চাদর টাঙ্গিয়ে যেভাবে আলাদা কক্ষ তৈরি করা হয়, সেভাবে হিজাব টাঙ্গিয়ে ঘরের ভেতর সাময়িক কক্ষ সৃষ্টি করা হতো। নবী যখন তাঁর ঘরে স্ত্রী-কন্যাদের নিয়ে একসাথে থাকতেন, তখন প্রায়ই সাহাবিরা গল্পগুজব করতে আসতো। দূর থেকে মেহমানরা দেখা-সাক্ষাৎ করতে আসতো। একটি ছোট ঘরে হুটহাট অপরিচিত মানুষজন আসায় নবী পরিবারের নারী সদস্যরা বিব্রত বোধ করতেন। এ জন্য হিজাব টাঙ্গিয়ে, অর্থাৎ ঘরের মাঝখানে চাদর-সদৃশ কাপড় টাঙ্গিয়ে, নারী সদস্যদের প্রাইভ্যাসি দেয়া হতো।

কিন্তু নবীর মৃত্যুর পর হিজাব শব্দটিকে কোরানের বিভিন্ন আয়াতের সাথে মিশিয়ে এর অর্থ ও পরিধি বাড়ানো হয়েছে। বিকৃত করা হয়েছে আসল রূপ। খিমার, জিলবাব, প্রভৃতি বিষয়কে হিজাবের সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে। যে-আয়াতগুলো কেবল নবীর স্ত্রী-কন্যার জন্য প্রযোজ্য, সে-আয়াতগুলোকেও সাধারণ নারীদের ওপর চাপানো হয়েছে। এ কৃতিত্ব মতলববাজ ধর্মবণিকদের।

নবীর কোনো স্ত্রী ও কন্যা বুরকা পরতেন না। তাঁর স্ত্রী খাদিজা মুখ খোলা রেখে চলাফেরা করতেন। তিনি স্বাধীনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যও করতেন। নিয়মিত হাট-বাজারে যেতেন। ইসলামের নামে অতিরঞ্জিত কিছু পালন করা ইসলামসম্মত নয়। কোরানে কোথাও নারীদেরকে বুরকা পরতে

নির্দেশ দেয়া হয় নি। বরং কিছু আয়াত পড়ে মনে হয়েছে, বুরকা একটি ইসলাম-বিরোধী পোশাক।

এই মুহূর্তে বিশ্বের অনেকগুলো দেশে বুরকা নিষিদ্ধ। কারণ আধুনিক রাষ্ট্রে বুরকা একটি গুরুতর নিরাপত্তা হুমকি। বুরকা নিষিদ্ধ মানেই হিজাব নিষিদ্ধ নয়। ফ্রান্স বুরকা নিষিদ্ধ করেছে, যেরকম নিষিদ্ধ করেছে মরক্কোসহ আরও অনেক মুসলিম দেশ, কিন্তু এ দেশগুলো হিজাব নিষিদ্ধ করে নি। কোথাও "অমুক দেশ হিজাব নিষিদ্ধ করেছে"– এমন শোরগোল শুনলে বুঝতে হবে, মতলববাজরা ভুল তথ্য প্রচার করছে। সঠিক তথ্য হবে– অমুক দেশ বুরকা নিষিদ্ধ করেছে। ইসলামে হিজাব আছে, বুরকা নেই।

সম্প্রতি লক্ষ করেছি, বাংলাদেশ পুলিশ প্রায়ই বুরকা পরা ইয়াবা ও গাঁজা-ব্যবসায়ী আটক করছে। ছেলেরা বুরকা পরে মেয়ে সেজে মাদক ব্যবসা করছে। সেদিক থেকে দেখলে বুরকা শুধু ইসলামবিরোধী পোশাক নয়, এটি একটি জনবিরোধী পোশাকও বটে।

কেউ বুরকা পরতে চাইলে পরুক, এতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ চাহিবামাত্র তাকে নেকাব সরিয়ে মুখমণ্ডল প্রদর্শন করতে হবে। 'পরিচয় যাচাই' বা 'আইডি ভেরিফিকেশন' খুবই গুরুত্বপূর্ণ 'পাবলিক ইন্টারেস্ট'। আধুনিক রাষ্ট্রে মানুষের স্বাধীনতা অবাধ নয়। স্বাধীনতার সীমানা আছে। কারও ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় স্বাধীনতা 'পাবলিক ইন্টারেস্ট'-এর সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারবে না। পাবলিক সিকিউরিটি, রুল অব ল, ফেয়ারনেস অব জাস্টিস– এ বিষয়গুলো রাষ্ট্রব্যবস্থার খুব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এগুলোকে ফাঁকি দিতে ধর্মীয় স্বাধীনতার দোহাই দেয়া গ্রহণযোগ্য নয়।

বুরকা নারীর ব্যক্তিত্বকেও নষ্ট করে। বুরকা পরা নারীদের অনেকেই 'লো সেল্ফ-ইস্টিম' বা হীনম্মন্যতায় ভোগেন। তাদের সাহস, মনোবল, ও আত্মবিশ্বাস কম থাকে। এ জন্য নারীদের উচিত, যথাসম্ভব বুরকা পরিহার করা। বুরকা ইসলামের কোনো অংশ নয়। একটি বিশেষ মহল বুরকাকে ইসলামি পোশাক বলে প্রচার করছে। বুরকা পরার সাথে আল্লাহকে পাওয়ার, বা বেহেশতে যাওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। কাউকে বুরকা পরতে বাধ্য করা, বা সারাক্ষণ ধর্মের ভয়ে বুরকা পরা, এগুলো আল্লাহর

পছন্দের কাজ নয়। নবীর জীবদ্দশায় মুসলিম নারীরা রঙিন ও জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরতেন।

হিজাব কী? হিজাব শব্দটির বিবর্তিত অর্থ এখন এরকম– লজ্জাস্থান ঢেকে ও মুখ খোলা রেখে আরামদায়ক পোশাক-আশাক পরিধান করা। শাড়ি,সালওয়ার-কামিজ, প্যান্ট, টি-শার্ট, চাদর, স্কার্ট, ব্লাউজ, এগুলো সবই হিজাব। হিজাব মানেই চোখ-মুখ ঢেকে ফেলা নয়। খিমার, জিলবাব, যিনাতাহুন্না, এসবের সাথে চোখ-মুখ ঢাকার কোনো সম্পর্ক নেই।

১৩.

বই কী? এনিথিং দ্যাট ক্যান ট্রান্সমিট নলেজ ইজ বুক। একটি গাছও বই, যদি গাছটির দিকে তাকালে আমার ভেতর জ্ঞানের সঞ্চার ঘটে। কারও মুখে গল্প শুনছি, আর সে-গল্প আমার ভাবনার জগৎকে নাড়া দিচ্ছে, তাহলে গল্প-বলা মানুষটি একটি বই। কোনো কারখানায় ঢুকে যদি মনে হয়, শ্রমিকদের মুখে অভাব, দুঃখ, ও অপুষ্টির ছবি চিকচিক করছে, তাহলে লোকগুলোকে বই হিশেবে পাঠ করতে অসুবিধা নেই। বই বলতে যারা কেবল মুদ্রিত বই বোঝে, তারা হ্রস্বদৃষ্টির পাঠক। যখন মানুষ লিখতে জানতো না, কাগজ বা প্যাপিরাস স্ক্রল যখন পৃথিবীতে ছিলো না, তখনও সমাজে বই ছিলো। কোথাও এক ঝাঁক পাখি উড়ে যাচ্ছে, এর অন্য অর্থ– আকাশে এক ঝাঁক বই ভেসে বেড়াচ্ছে। সবচেয়ে বড় বন আমাজন, এমনটি না বলে ‘সবচেয়ে বড় গ্রন্থাগার আমাজন’, এভাবেও বলা সম্ভব। হাওড়, হ্রদ, মরুভূমি, সবকিছুই পাঠযোগ্য। এভরিথিং উই সি আর থ্রি ডাইমেনশোনাল টেক্সটস। চাইলেই মানুষ সেগুলোকে পড়তে পারে। পড়া কী? অ্যানি অ্যাক্ট দ্যাট ক্যান এক্সট্রাক্ট নলেজ ইজ রিডিং। যখন কোনো মাছের শব্দ শুনি, তখন মাছটিকে মূলত আমরা পাঠ করি। আমি তো কবরস্থানকেও পড়তে পারি। কবরস্থান কী? আ লাইব্রেরি অব মিসিং বুকস।

১৪.

যিনি আরবি জানেন না, তার আরবি সূরা পড়ে নামাজ পড়া ঠিক নয়। আল্লাহ বাংলা বুঝেন না, এমনটি ভাবার অর্থ হলো– আল্লাহর বোধশক্তি কম। সাত হাজার মর্ত্যভাষার ভেতর তিনি বুঝেন মাত্র একটি। বাংলার চেয়ে আরবি আল্লাহর অধিক প্রিয়, এমন কল্পনার মানে দাঁড়ায়– আল্লাহ বর্ণবাদী। ভাষা, অঞ্চল, ও জাতিভিত্তিক বৈষম্য তিনি পছন্দ করেন। যে-লোক প্রার্থনা করলো, সে যদি বুঝতেই না পারলো যে ঈশ্বরের কাছে সে কী চাইলো, তাহলে ওই প্রার্থনা হাস্যকর ও নিরর্থক।

আমি নামাজ পড়ুয়া বহু মুসলমানের সাথে কথা বলে দেখেছি, তারা সূরা ফাতিহার অর্থ জানে না। সূরা ইখলাসে কী বলা হয়েছে, তা তাদের নিকট অজানা। কোটি কোটি মানুষ 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' জপছে, কিন্তু এটি দ্বারা কী বুঝানো হচ্ছে, তা বলতে পারে না। আল্লাহ কেবল প্রশংসাকারীর কথা শোনেন, এমন দাবি সুখকর হলে, স্বৈরাচারী একনায়করা তোষামোদকারীর কথা শুনতে পারবে না কেন, এ প্রশ্ন নামাজীদের মাথায় জাগছে না। সেজদায় গিয়ে তারা ঘোষণা করছে– সুবহানা রাব্বিয়াল আলা, আর কিছু বলছে না। সেজদাকে বানিয়ে ফেলা হয়েছে শ্লোগানময় মিছিলো। মাটিতে কপাল ঠেকছে, কিন্তু হৃদয় ঠেকছে না। আঙুল টিপে টিপে হিসাব রাখছে– কতোবার কী পড়লাম, তা। যেন প্রার্থনা নয়, এ এক পাটিগণিতের ক্লাস। মৃত্যুর দেড় হাজার বছর পরও অভিসম্পাত করা হচ্ছে– ধ্বংস হোক আবু লাহাবের হাত। শুধু আবু লাহাব নয়, তার বউকেও অভিশাপ দেওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে, ফী জিদিহা হাবলুম মিম-মাসাদ। তার বউয়ের গলায় যেন শক্ত দড়ি বাঁধা থাকে। নামাজে দাঁড়িয়ে একজন নারীর গলায় আপনি দড়ি দেখতে চান, এটা কোনো প্রার্থনা? এভাবে ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব? সম্ভব না।

১৫.

এ সমাজ পেট্রোলবাহী গাড়ির মতো, যার পেছনে লেখা থাকে: সাবধান, দূরে থাকুন। দাহ্য পদার্থ।

একটু অপছন্দের কিছু লিখলেই এখানে আগুন লেগে যায়। জ্বলে ওঠে হরেক রকম সলতে। এটি ইঙ্গিত দেয়, সমাজে পর্যাপ্ত কেরোসিন আছে। আমার লক্ষ্য হলো– কেরোসিন সাফ করা। অর্থাৎ শিশুদের জন্য একটি আগুনমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা।

১৬.

'পোশাকের স্বাধীনতা'– কথাটি বোরকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ বোরকা যিনি পরেন, তিনি স্বাধীন নন। তার চিন্তা পরাধীন, আচরণ পরাধীন, কল্পনা পরাধীন। তার চলাফেরা নিয়ন্ত্রিত। স্বাধীনভাবে পোশাক পছন্দ করার ক্ষমতা তার নেই। যেহেতু ধর্ম ও সমাজের ভয় তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেন না, এবং ভয়কে জয় করার কোনো চেষ্টাও করেন না, তাই তার পছন্দের সীমা নির্ধারিত হয় ভয় দ্বারা। 'নারীর অধিকার রয়েছে ইচ্ছেমতো পোশাক নির্বাচন করার'– এই যে বহুল উচ্চারিত বাক্যটি, যা ঢাল হিশেবে ব্যবহৃত হচ্ছে হাতুড়ি সম্প্রদায় দ্বারা, এখানে একটি গুরুতর ফাঁকি রয়েছে। 'ইচ্ছে' ও 'নির্বাচন' কাকে বলে? আমার আলমারিতে দশ প্রকার পোশাক আছে, কিন্তু আমি বেছে বেছে পরছি কেবল বিশেষ ঘরানার পোশাক, এটিকে কি 'ইচ্ছে' ও 'নির্বাচন' বলে? বলে না। ভোটের ব্যালটে মার্কা আছে বিশটি, কিন্তু আমি ভয় পেয়ে সিল মারছি শুধু একটি বিশেষ মার্কায়, এটিকে কি বলা যায় ইচ্ছেমতো ভোট দেয়া? যায় না। বোরকা পরা নারীর কোনো স্বাধীন 'ইচ্ছা' থাকে না। সমাজ ও ধর্মের ইচ্ছাই তার ইচ্ছা। ধর্ম যদি বলে– বোরকা না পরলে দোযখে যাবেন, দোযখে আছে কঠিন আযাব ও কোটি কোটি টর্চার ডিভাইস, বা সমাজ যদি বলে– বোরকা পরা সচ্চরিত্রের লক্ষণ, বোরকা আল্লাহর পছন্দের পোশাক, তাহলে কি পোশাক নির্বাচনের স্বাধীন ইচ্ছা কারও থাকে? থাকে না। শাড়ি, কামিজ, সালোয়ার, গেঞ্জি, জিন্স, স্কার্ট, এগুলো কি কোনো নারী ধর্মের ভয়ে পরে? পরে না। কাউকে কি আমরা বলতে শুনেছি, শাড়ি না পরলে দোযখে যেতে হবে? কেউ কি লোভ দেখিয়েছে, জিন্স পরলে বেহেশতে যাওয়া যায়? কিন্তু বোরকার ক্ষেত্রে এটি ঘটছে। দিনরাত মাইক লাগিয়ে বর্ণনা করা হচ্ছে বোরকা পরার ফজিলত।

১৭.

লেখার স্পষ্টতা মূলত চিন্তার স্পষ্টতার ফসল। যার চিন্তা স্পষ্ট নয়, তার লেখাও স্পষ্ট নয়। চিন্তায় আড়ষ্টতা থাকলে লেখায় আড়ষ্টতা অনিবার্য। পণ্ডিতি দেখানোর লক্ষ্যে হঠাৎ বিদেশি বই খুলে অনুবাদ শুরু করলে– তাতে না থাকে পাণ্ডিত্য, না থাকে বুদ্ধি বা বোধের ছাপ। বিদেশী জ্ঞানকে আত্মস্থ না করে যারা কেবল শ্রোতা মুগ্ধকরণ প্রকল্প খোলে, তাদেরকে আমি মুগ্ধজীবী বলতে পারি, কিন্তু বুদ্ধিজীবী নয়। বেকুবজীবীও বলা যায়, কারণ পাঠককে বেকুব বানানোর উদ্দেশ্যে নানা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য ও অস্পষ্ট যুক্তি তারা একের পর এক আউড়াতে থাকে। অপ্রয়োজনীয় শব্দ, অপ্রয়োজনীয় বাক্য– এগুলো তখনই আসে, যখন আমি জানবো না আমি কী লিখছি বা বলছি, তা। যা নিজে বুঝি না, তা অন্যকে বোঝাতে যাই কী করে? চিন্তার স্থূলতা যে বাক্যের স্থূলতার প্রধান উৎস, তা বুড়ো ও তরুণ, উভয় দলই ভুলে গেছে। ব্যাড থিংকার্স আর অলওয়েজ গুড টকার্স।

১৮.

মানুষকে ধর্মশূন্য করা আমার লক্ষ্য নয়। ধর্মের ক্ষতিকর দিক যেমন আছে, তেমনি এর উপকারী দিকও আছে। ধর্ম না থাকলে জানাজা, সৎকার, আভেলুত, প্রার্থনা, উৎসব, শেষকৃত্য, বিয়ে, এগুলো থাকতো না। জানাজা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মৃত্যুর পর একটি জীবকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় দেয়া, এটি মানুষ ছাড়া আর কোনো প্রাণীর ক্ষেত্রে ঘটে না। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া আমাদের কী দেয়? এমনিতে মনে হয় কিছুই দেয় না, তবে গভীরভাবে তাকালে দেখা যাবে, এটি সমাজে একধরনের 'সেন্স অব মিনিং' সৃষ্টি করে। প্রার্থনায় ঈশ্বরের হয়তো কিছুই যায় আসে না, কিন্তু প্রার্থনাকারীর মনে এটি বড় পরিবর্তন আনে। সমাজের যে-কালচারাল ও মোরাল ভ্যালু, তাও কিছুটা ধর্মের হাত ধরেই সংরক্ষিত হয়। ন্যায়বিচার, আইনের শাসন, অধিকার, সমতা, এগুলোর পরিচর্যায় ধর্মের ভালো ভূমিকা আছে। নিটশা যে বলেছিলেন, গড ইজ ডেড, কেন বলেছিলেন? নিটশার কথার অর্থ এই নয় যে ঈশ্বরের আর প্রয়োজন নেই, বা ঈশ্বর মারা গেছেন। বরং কথাটি তিনি বলেছিলেন আক্ষেপ করে। কারণ ওই সময়, ইউরোপে ধর্মভিত্তিক

খ্রিষ্টীয় মোরালিটি দ্রুত উধাও হয়ে যাচ্ছিলো। ফলে সমাজ একেবারেই নিহিলিস্টিক ভ্যাকুয়ামের দিকে চলে যায় কিনা, এমন আশংকা তৈরি হয়েছিলো। যন্ত্রসভ্যতার ফাঁদে পড়ে মানুষ যেন মেকানিক্যাল রোবট না হয়ে ওঠে, জীবনের মানে যেন সে হারিয়ে না ফেলে, এ ভয় থেকেই নিটশা উচ্চারণ করেছিলেন– গড ইজ ডেড! শরবত দীর্ঘকাল সংরক্ষণের জন্য যেমন প্রিজার্ভেটিভ দরকার, তেমনি কোনো প্রথা, আচার, রীতি, সংস্কৃতি, এগুলো টিকিয়ে রাখার জন্যও ধর্ম দরকার। এ বিবেচনায়, ধর্ম একপ্রকার কালচারাল প্রিজার্ভেটিভ।

কিন্তু 'ধর্ম' কী? ধর্ম হলো 'প্যাকেজ অব কালচার্স' বা সংস্কৃতির সমারোহ। কিছু নির্দিষ্ট সংস্কৃতি একীভূত হয়ে যখন কালেক্টিভ প্রথা আকারে সমাজে বিরাজ করে, তখন সেটিকে ধর্ম বলে। 'ধর্ম' আর 'প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম' এক জিনিস নয়। ইসলাম, ক্রিশ্চিয়ানিটি, ইহুদীবাদ, হিন্দুত্ববাদ, এগুলো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম। অর্গানাইজড রিলিজোন। অর্গানাইজড রিলিজোন আগ্রাসী। এর রাজনীতিক ক্ষমতা আছে। অন্য ধর্ম, অন্য মত, অন্য নবী, অন্য সংস্কৃতি, এগুলোর প্রতি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলো সহনশীল নয়।

১৯.

বাংলাদেশের মানুষ সব জানে, শুধু রাষ্ট্র কীভাবে চলে তা জানে না। কৃষকদের সাথে এখানে কৃষিসচিবের পরিচয় নেই। দোকানীরা চেনে না বাণিজ্যসচিবকে। কোথায় কী বিষয়ে কৈফিয়ত চাইতে হবে, এ ব্যাপারে কারও কোনো ধারণা নেই। ডিসি ও ইউএনওর কাজ কী, তাদের ক্ষমতার সীমা কোথায়, তা নাগরিকরা জানতে চায় না। পুলিশের দিকে তাকিয়ে তারা জপে– গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা। মন্ত্রী দেখলে ভিড় শুরু করে কীটপতঙ্গের মতো। গণতন্ত্র বলতে তারা বুঝে শুধু ভোট দেয়া। সংসদের কার্যাবলী সম্পর্কে তাদের জ্ঞান শূন্য। আইন প্রণয়নের ভার কাদের হাতে দেয়া উচিত, আইন কীভাবে অধিকার খর্ব করে, হাউ টু স্ট্রাইক আ ফাইন ব্যালান্স বিটউইন রাইটস অ্যান্ড ল, এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ কী, তা কেউ বলতে পারে না। পত্রিকার সাথে মগজ ধোলাইকারক মেশিনের পার্থক্য কী, টেলিভিশনের সব কথা বিশ্বাস করা

ঠিক কি না, এ জরুরি পাঠগুলোও কেউ নিচ্ছে না। অর্থাৎ দরকারি কোনোকিছু সম্পর্কেই তাদের জ্ঞান নেই। অথচ কারও সাথে এরা তর্ক শুরু করে এভাবে: তুই আমার চেয়ে বেশি বুঝোস?

২০.

খুব খারাপ কথা খুব উঁচু স্বরে বলতে পারাই বাকস্বাধীনতা। ভালো ভালো মিষ্টি কথা বলতে বাকস্বাধীনতার কোনো প্রয়োজন নেই। বাকস্বাধীনতা দরকার তখন, যখন আমি উচ্চারণ করতে চাই এমন সত্য, যা আপনি শুনতে চান না। যা শুনলে ও দেখলে রাগে টলে উঠেন খড়কুটোর মতো, যা আপনার ভাবনার জগৎকে লণ্ডভণ্ড করে দেয় এক ঝটকায়, তা নির্বিঘ্নে প্রকাশ করতে পারাই বাকস্বাধীনতা। মুখে ব্রণ আছে কি না তা দেখার জন্য আয়না যথেষ্ট হলেও, পিঠে ফোড়া আছে কি না তা জানার জন্য আপনাকে বাকস্বাধীনতার কাছে যেতে হবে। বাকস্বাধীনতা আমাকে, আপনার পিঠের ফোড়া ও তার ভেতরে জমা পুঁজের কথা বলতে বলে।

২১.

আমি কিছু পাখির সংসার দেখেছি, এবং মানুষের ওপর বিরক্ত হয়েছি। পাখিরা মানুষের মতো ঝগড়াটে নয়, তর্কপ্রিয় নয়। বাসা বানানোর পর এক পাখি আরেক পাখিকে ছেড়ে চলে গেছে, বা কিল-ঘুষি মেরেছে, এমন চিত্র নজরে পড়ে নি। যৌতুক ও গয়নার অস্তিত্ব পাখি সমাজে নেই। পাখিরা যেভাবে ভালোবাসার ট্রান্সমিশন ঘটায়, সেভাবে মানুষ পারে না। অনেক লটবহর নিয়েও মানুষ তার সঙ্গীকে বোঝাতে পারে না যে, তোমার প্রতি আমার টান আছে। এটা নেই, সেটা নেই, এটা দাও, সেটা দাও, এরকম টানাপোড়ন মানুষের সংসারে লেগেই আছে। তার চাহিদা ও আফসোস অসীম। পদে পদে একে অন্যের খুঁত ধরছে। একই খাটে শুয়েও ঘুমোচ্ছে পাশ ফিরে। তাদের শরীর কাছাকাছি আসছে, কিন্তু হৃদয় পালিয়ে বেড়াচ্ছে। চোখ বুজে লিপ্ত হচ্ছে কলহে। অকারণে একজন আরেকজনকে অপমান করছে। গালমন্দ করছে কুৎসিত ভাষায়। জনি ডেপ ও এম্বার

হার্ড, কলহ করতে গিয়ে বিছানায় পায়খানা পর্যন্ত করে ফেলেছে। পাখি সমাজে এসব অকল্পনীয়। পাখিদের হয়তো ইট-সিমেন্ট নেই, খাট-পালং নেই, কিন্তু ভালোবাসার আঁটায় যে-ঘর তারা বানায়, তা ফোর্ট নক্সের চেয়ে কম মজবুত নয়।

২২.

ফেসবুকের যে-কাঠামো, তা ডিজাইন করা হয়েছে শিয়ালদের কথা মাথায় রেখে। অথচ এটি ব্যবহার করছে মানুষ। কোনো বিষয়ে হুক্কা-হুয়া করার জন্য এর চেয়ে উপযুক্ত মাধ্যম আর হয় না। এটি এমন এক বন, যেখানে আইনস্টাইন তাঁর জেনারেল রিলেটিভিটি নিয়ে কথা বললে বইবে পিনপতন নীরবতা। কিন্তু যদি বলেন, আমি লালন ফকিরের চেয়ে বেশি জ্ঞানী, তাহলে ঘুষাঘুষি শুরু হয়ে যাবে। রবীন্দ্রনাথ একটি একাউন্ট খুলে যদি 'আচারের অত্যাচার' বা 'বিলাসের ফাঁস' পোস্ট করেন, তাহলে কোনো জ্ঞানমাস্তান তা নিয়ে হৈচৈ করবে না। কিন্তু যদি বলেন, আমি পাতি মজুমদারের চেয়ে বড় লেখক, তাহলে আর রক্ষে নেই। ঠাকুরের কলিজাটি ছিঁড়ে লাখ টুকরো করে ফেলা হবে। বুদ্ধির প্রাথমিক স্তরে যাদের বাস, তারা এখানে বুদ্ধির শেষ স্তরে থাকা মানুষদের সনদ দিচ্ছে। বকনা বাছুর নকল করছে মোষের কণ্ঠ। বিড়াল গোঁফ বিকৃত করে পরিচয় দিচ্ছে– দেখো, আমি বাঘ।

২৩.

ইসলাম পালন ও ইসলাম-ব্যবসা এক জিনিস নয়। ইসলাম-ব্যবসার প্রধান উপকরণ মূর্খতা। কোনো জ্ঞানী লোক ইসলাম-ব্যবসার কাস্টমার নয়। যারা কোরান জানে না, কোরান পড়ে না, কোথাও আরবি বাক্য দেখলেই যারা ধরে নেয় তা আল্লাহ-রসুলের বাণী, তারাই ইসলাম-ব্যবসার প্রধান খদ্দের। কেউ যদি আরবিতে লা ইলাহা ইল্লাশশাইতান লিখে কোনো কাগজ ওয়াজের মাঠে ফেলে আসে, তাহলে অনেক লোকই কাগজটিকে মাটি থেকে কুড়িয়ে চুমো খাবে। ভাববে, কোরানের আয়াত। কিছুদিন আগে

মক্কায় এক ইমাম টিভিতে সাক্ষাৎকার দিচ্ছিলেন। সাংবাদিক প্রশ্ন করছিলেন, ভদ্রলোক উত্তর বলছিলেন। কিন্তু আশেপাশে থাকা মূর্খগণ মোনাজাতের ভঙ্গিতে হাত উঠিয়ে আমিন আমিন বলছিলো। ভেবেছিলো, ইমাম সাহেব বুঝি আরবিতে দোয়া পড়ছেন। এই হলো অবস্থা। যতোদিন ধর্মীয় মূর্খতা থাকবে, আরবি ভাষার প্রতি লোকজন অকারণে সমীহ দেখাবে, ততোদিন ইসলাম-ব্যবসা চলবে। বণিকরাও তাই চায়। সাধারণ মুসলমানরা কোরান পড়বে, কোরান বুঝবে, প্রশ্ন করবে, তর্কাতর্কি করবে, এটি তারা চায় না। তাদের চাওয়া শুধু রিডিং পড়া। সুর করে তেলাওয়াত করা। কেউ কোরানের অর্থ বুঝে এর গভীরে প্রবেশ করবে, মতামত দান করবে, হাদিসের উৎস সন্ধান করবে, এটি ধর্মদোকানীদের চাওয়া নয়। দোকানদাররা বোঝায়– দোয়া আরবিতে করতে হবে, নামাজ আরবিতে পড়তে হবে, জানাজা আরবিতে সারতে হবে, খুতবা আরবিতে ছুঁড়তে হবে; যেন আরবি ছাড়া আর কোনো ভাষা আল্লাহ বুঝেন না। এগুলো সবই ব্যবসার অংশ। প্রার্থনার যে কোনো ভাষা হয় না, আল্লাহর চোখে বাংলা ও আরবি, দুটি ভাষাই যে সমান, এ কথা দোকানীরা গোপন রাখে।

২৪.

ঈগলকে মাঝেমধ্যে কাক আক্রমণ করে। পিঠে চড়ে টানা ঠোকরাতে থাকে। কিন্তু ঈগল কি কাককে পাল্টা ঠোকর দেয়? দেয় না। সে নির্বিকারভাবে উপরে উঠতে থাকে। কারণ কাকের সাথে ঝগড়া করে সময় ও শক্তি, কোনোটিই সে খরচ করতে চায় না। একপর্যায়ে কী ঘটে? যখন ঈগল অনেক উপরে উঠে যায়, তখন ভয় পেয়ে কাক নিজেই নিচে নামতে থাকে। বা অক্সিজেন স্বল্পতায় মৃত্যুবরণ করে। এটা বলার কারণ হলো, যখনই কোনো লেখা পড়ে সমাজ লেখককে কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ করে, বা সমাজের দারোয়ানরা লাঠি হাতে তেড়ে আসে, তখনই আমার চোখে একটি ঈগল ও কাকের ছবি ভেসে ওঠে। লেখকের কাজ লিখে যাওয়া, চিন্তা করা, ও প্রতিষ্ঠিত চিন্তাকে আঘাত করা। কাকের সাথে যুদ্ধ করা তো লেখকের কাজ নয়।

২৫.

আপনি ইসলামের কিছুই বুঝেন না, ইসলাম বিষয়ে আপনার প্রাথমিক জ্ঞানও নেই– এরকম কথা প্রায়ই শুনি। প্রশ্ন হলো, কেউ ইসলামের কিছুই বুঝে না, কথাটি ইসলামের জন্য উপকারী কি না? আমি বলবো অপকারী। কারণ এতে প্রকাশ পায়, ইসলাম একটি জটিল ধর্ম, এবং এটি মানুষের জন্য উপযুক্ত নয়। আমি একজন স্বাভাবিক বুদ্ধির উচ্চশিক্ষিত মানুষ, যার চিন্তাশক্তি ও লিটারারি মাস্টারি ভালো। দর্শন, আইন, সাহিত্য, যুক্তিবিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব, গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, বিবর্তনতত্ত্ব, কোরান, এ বিষয়গুলোতে আমার পড়াশোনা আছে। এরকম একজন লোকের কাছে যদি ইসলাম দুর্বোধ্য হয়, তাহলে তা সাধারণ কৃষক ও শ্রমিকের কাছে সুবোধ্য হবে কীভাবে, তা বুঝে আসে না।

এ জন্য প্রশ্ন জাগে, ইসলাম আসলে কাদের জন্য এসেছে? কোটি কোটি মানুষ এ দেশে নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, হজে যায়। তারা কি সকলেই আমার চেয়ে ইসলাম বেশি বোঝে? না কি তারাও আমার মতো ইসলামের প্রাথমিক জ্ঞান না রেখেই এসব করছে? হযরত উমর, আবু বকর, ওসমান, আলী, আবু হুরায়রা, তাঁদের চেয়ে আমার জ্ঞান, বুদ্ধি, ও প্রতিভা কম হওয়ার সম্ভাবনা কতোটুকু? তাঁরা কি কেউ মাদ্রাসার ছাত্র ছিলেন? বরং ঐতিহাসিক সত্য আমলে নিলে, তাঁদের শিক্ষা ও পড়াশোনা, একজন সাধারণ বাঙালি মুসলমানের চেয়ে বেশি হওয়ার কথা নয়। তারা ইসলাম বুঝলে, আমি ইসলাম বুঝবো না কেন, এ প্রশ্নের সুরাহা হওয়া দরকার। নাকি মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে নিজেকে ওয়াজ ও মিথ্যে কথার মেশিন না বানানো পর্যন্ত কেউ ইসলাম বুঝবে না?

২৬.

আমি মারা যাওয়ার পর ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়া ঠিক হবে না। পড়তে হবে লাকাদ কানা রাজুলান হাকিমান জিদ্দান। কারণ আমি জ্ঞানী মানুষ।

২৭.

ধর্মগ্রন্থগুলো যতোই পড়ি, ততোই অবাক হই। বইগুলোতে আদম, হারুন, দাউদ, এলিশা, ইদ্রিস, ইলিয়াস, ইসমাইল, ইয়াকুব, ইব্রাহিম, ইয়াহিয়া, মুসা, লুকমান, জুলকারনাইন, সোলায়মান, কতোজনের নাম আছে, কিন্তু সক্রেটিসের নাম নেই। নেই পিথাগোরাস, হেরাক্লাইটাস, পারমিনিডিস, এমপেডোক্লিস, এনাক্সাগোরাস, থ্যালিস, প্লেটো, জিনো, বা অ্যারিস্টোটলের নাম। শয়তান ও ফেরাউন নিয়ে গল্প আছে অনেক, কিন্তু এপিকিউরাস, গৌতম বুদ্ধ, ও কনফুসিয়াস নিয়ে কোনো বাক্য নেই। হাতি, উট, গাধা, নেকড়ে, এগুলো ধর্মগ্রন্থে স্থান পেলেও হোমার বা আর্যভট্ট স্থান পান নি। স্থান পান নি ইউক্লিড, শানফারা, ও ইমরুল কায়েস। এর কারণ কী?

এর কারণ– হয় ধর্মপ্রণেতারা তাঁদের কথা জানতেন না; অথবা দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা, এসব বিষয়ে ধর্মের কোনো আগ্রহ নেই।

২৮.

(ক)

সবার ভোটাধিকার থাকা উচিত নয়। ভোট কী? ভোট হলো নিজস্ব চিন্তা ও বোধ খাটিয়ে কাউকে শাসনকার্যের জন্য নির্বাচিত করা। রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্পর্কে যিনি ওয়াকিবহাল নন, আইনের শাসন ও আগ্রাসন সম্পর্কে যার কোনো ধারণা নেই, যিনি চলেন অন্যের বুদ্ধিতে, ভেড়ার ভিড়ে নেকড়ে শনাক্ত করার চোখ যার নেই, তিনি ভোটাধিকার দিয়ে কী করবেন? ভোট একটি ইনফর্মড ডিসিশনের ব্যাপার। লোভ, আনুগত্য, হুজুগ, বিজ্ঞাপন, এসবের ঊর্ধ্বে উঠে ভোটের সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কাকে ভোট দিলে কী ঘটবে, সে-ব্যাপারে ভালো অনুমান যার নেই, তিনি ব্যালট পেপার নষ্ট করবেন কেন? গণতন্ত্রের যে-সংস্করণ পৃথিবীতে চলছে, তা সংখ্যার গণতন্ত্র। গুণ বা মানের নয়। সংখ্যার গণতন্ত্র থেকে মানুষকে বেরিয়ে আসতে হবে। বয়স হলেই ভোটাধিকার, এমন নিয়ম বাতিল করে ভোটার নিবন্ধন পরীক্ষা চালু করা দরকার। যারা এ পরীক্ষায় পাশ করবেন, কেবল তারাই ভোটার হবেন। অন্যরা নয়।

এটি আমরা দুইভাবে করতে পারি। এক– ইশকুলে ‘ভোটার সচেতনতা’ নামে নতুন সাবজেক্ট চালু করে। ছাত্ররা এ সাবজেক্টে পাশ করলে ভোটার হিশেবে বিবেচিত হবে। দুই– যারা নিরক্ষর ও ইশকুলে যান না, তারা একটি মৌখিক ভোটার মূল্যায়ন পরীক্ষায় অংশ নেবেন। এ কাজ, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে, ভোটার নিবন্ধনকারী ফিল্ড অফিসারদের দিয়ে করানো যেতে পারে। তবে দীর্ঘকাল এটির প্রয়োজন পড়বে না। কারণ নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা সমাজে ধীরে ধীরে কমতে থাকবে, এবং একসময় ইশকুলের ‘ভোটার সচেতনতা’ কোর্সটিই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে।

(খ)

ভোটাধিকার কি মৌলিক মানবাধিকার? না, তা নয়। বরং ভোটাধিকার একটি সুবিধাজনক রাজনীতিক অধিকার, যা কেবল গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় প্রয়োগ করা যায়। অধিকারটি আনকন্ডিশোনাল বা নিরঙ্কুশ নয়। ন্যাচারাল রাইটসের সাথে এটিকে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। আমি যে ভোটাধিকারকে ‘সুবিধাজনক রাজনীতিক অধিকার’ বা ‘কানভিনিয়েন্ট পলিটিক্যাল রাইট’ বলছি, এর কারণ– গণতন্ত্রে ‘ভোট’-ই একমাত্র ব্যবস্থা নয়, যা দিয়ে সরকার নির্বাচিত করা যায়। ভোট কেবল একটি ‘সুবিধাজনক’ ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় ‘সকলেই’ সরকার নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে। কিন্তু ‘সকলেই’ কারা? একজন শিশু কি ‘সকল’-এর অংশ? সে কি ভোট দিতে পারে? পারে না। কারণ শিশুর চিন্তা, বোধ, ও বিবেচনার ওপর সমাজের আস্থা নেই। সমাজ বিশ্বাস করে– যার বয়স ১৭ বছর ১১ মাস ২৯ দিন, সে ভোট দেয়ার উপযুক্ত নয়, তার বুদ্ধি কম; কিন্তু যার বয়স ১ দিন বেশি, অর্থাৎ ১৮ বছর, সে ভোট দেয়ার উপযুক্ত। এক রাতে তার বুদ্ধি বেড়ে গেছে!

এমন বিশ্বাসের ভিত্তি হলো– নাগরিকদের ভোট দেয়ার যোগ্যতা বা ভোটার এলিজিবিলিটি এখানে নির্ধারিত হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা দ্বারা। কগনাটিভ এবিলিটিকে মানদণ্ড ধরে একটি ফিল্টারিং বা যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া সমাজে চালু আছে। নির্দিষ্ট বয়সের নিচে কাউকে ভোটাধিকার দেয়া হচ্ছে না। অর্থাৎ রাষ্ট্রের ‘সবাই’ ভোট দিতে পারছে না। সবার ভোটাধিকারে সমাজ বিশ্বাস করছে না। ফলে বলা যায়, ভোটাধিকার যে মানুষের কোনো

অ্যাবসোলিউট রাইট নয়, এটি কোয়ালিফায়েড রাইট, মাথায় ১৮ বছর বয়সীর বুদ্ধি না থাকলে যে ভোটাধিকার দেয়া ঠিক নয়, তা বর্তমান সমাজও স্বীকার করছে।

অথচ একই সমাজ আমার প্রস্তাবের বিরোধিতা করছে। আমি যে বলেছি, সবার ভোটাধিকার থাকা উচিত নয়, কেবল রাজনীতিকভাবে সচেতন মানুষরাই ভোটাধিকার পাওয়ার যোগ্য, এটি শিশুদের ওপর বহুকাল আগে থেকেই প্রয়োগ করা হচ্ছে। কিন্তু যখনই এটি বুড়োদের ওপর প্রয়োগ করার প্রস্তাব করলাম, তখনই বুড়োরা বাধা দিচ্ছে! বলছে, উনি তো এলিটিস্ট কথাবার্তা বলছেন। মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিতে চাইছেন। যদিও আমি যে-যুক্তিতে তাদের ভোটাধিকার নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলেছি, সে-একই যুক্তিতে তারা শিশুদের ভোটাধিকার হরণ করে রেখেছে।

ধরা যাক রহিমের বয়স ৩৫, করিমের ১২। রহিমের কগনাটিভ ইন্ডেক্স বা বুদ্ধিসূচক ১৫, করিমের ৫৫। এ হিসেবে, ১২ বছর বয়সী করিমের কগনাটিভ এবিলিটি ৩৫ বছর বয়সী রহিমের চেয়ে বেশি। কিন্তু আমরা করিমকে ভোট দিতে দিচ্ছি না, দিচ্ছি রহিমকে। আমরা ধরে নিয়েছি, রহিমের শরীরের ওজন যেহেতু বেশি, তাই তার বুদ্ধি-বিবেচনা বা কগনাটিভ এবিলিটিও বেশি। এমন মনোভাব গণতন্ত্রের জন্য বিপজ্জনক। ভোট ও লটারির মাঝে পার্থক্য থাকা দরকার।

(গ)

'ভোটার সচেতনতা' কোর্সটি কোন ক্লাশে পড়ানো উচিত, এটি একটি প্রশ্ন। এ ক্ষেত্রে আমার প্রস্তাব হলো– কোর্সটি পড়ানো দরকার পঞ্চম শ্রেণীতে। এর মোট নম্বর হবে ১০০, এবং কেউ মাত্র ১০ নম্বর পেলেই তাকে উত্তীর্ণ ঘোষণা করা হবে। কোর্সটির জন্য আমি একটি বই লিখছি, যেটিতে অধ্যায় আছে ১০টি। অধ্যায়গুলো এরকম: ১) রাষ্ট্র পরিচিতি, ২) সরকার পরিচিতি, ৩) আইন পরিচিতি, ৪) সংসদ পরিচিতি, ৫) পুলিশ পরিচিতি, ৬) হাসপাতাল পরিচিতি, ৭) পরিবেশ পরিচিতি, ৮) অধিকার পরিচিতি, ৯) শিক্ষা পরিচিতি, ও ১০) শান্তি পরিচিতি। এ দশটি অধ্যায় পড়ে মাত্র

দশ নম্বর পেলেই নাগরিকগণ ভোটার বলে বিবেচিত হবেন। ভোটার হওয়াকে আমি কঠিন করে তুলতে চাই না। আমার চাওয়া হলো, মানুষ যেন তার ভোটাধিকার সুচিন্তিতভাবে প্রয়োগ করতে শেখে। ভোটার হতে হলে পরীক্ষা দিতে হবে, এই ভয়ে তারা যেন রাষ্ট্র, সরকার, আইন, পুলিশ, এসব নিয়ে অল্পবিস্তর পড়াশোনা করে।

২৯.

বাংলাদেশ এখন পার করছে এমন এক বন্ধ্যা সময়, এমন ঘোর নিষ্ফলাকাল, যেন চোখ বুজেই একে আমরা ডাকতে পারি বন্ধ্যাভূমি। যেদিকে তাকাই, দেখি, শুধুই পোড়া গন্ধ। সবচেয়ে বেশি পুড়ছে শিশুরা। তারা দগ্ধ হচ্ছে অদৃশ্য খাঁচায়। খাঁচায় হাঁটা গেলেও উড়া যায় না। ইশকুল, মাদ্রাসা, প্রাইভেট, মোবাইল ফোন, এই তাদের জীবন। এর বাইরে আর কোনো রসের দেখা পাচ্ছে না। তাদের লেজ থাকলেও শিকড় নেই। শরীর নাদুস-নুদুস, কিন্তু মন চ্যাঁপা শুঁটকি। মনের কোনো খোরাক তারা পাচ্ছে না। যা খেলে পেট ভরে, তা সহজে কিনতে পারলেও, যা খেলে মন ভরে, চোখ ফোটে, তার দেখা কোনো দোকানেই মিলছে না। ফুলশয্যার সাথে তাদের পরিচয় আছে, কিন্তু ফুলের বাগানের সাথে পরিচয় নেই। একটি রেণু কীভাবে মাছ হয়ে ওঠে, এ খবর তারা রাখে না। সীবিচ তারা চেনে, কিন্তু সাগর চেনে না। এমন চারাগাছ থেকে কী করে আশা করি ফলদ বৃক্ষ? টাকা ছাড়া আর কোনো সার তাদের গোঁড়ায় কেউ ঢালছে না।

৩০.

বুখারি, মুসলিম, তিরমিযি, এ হাদিস সংকলনগুলো আমাকে মুগ্ধ করেছে। এগুলো না পড়লে জানতামই না–

(১) যুদ্ধবন্দী নারীদের ধর্ষণ করা বৈধ : তিরমিযি ১৫১০

(২) স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীকে ১৩০ দিন শোক পালন করতে হবে, কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুতে স্বামীকে কোনো শোক পালন করতে হবে না : বুখারি ৪৯৪২-৪৪

(৩) গিরগিটির মতো সুন্দর ও নিরীহ প্রাণীকে দেখা মাত্রই হত্যা করতে হবে। হত্যা করলে আমলনামায় লেখা হবে অনেক সওয়াব : মুসলিম ৫৬৯১-৯৭

(৪) চোরের হাত কেটে তার ঘাড়ে লটকিয়ে দিতে হবে : তিরমিযি ১৩৮৭

(৫) নবী তাঁর এক প্রতিপক্ষের খেজুর বাগান আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন : বুখারি ২৮০২

(৬) হযরত আলী এক ব্যক্তিকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছিলেন : বুখারি ২৭৯৮

(৭) কোনো প্রবাসী শ্রমিক যদি মনিবের অত্যাচারে নিজ দেশে পালিয়ে আসে, তাহলে তার নামাজ কবুল হবে না, সে কাফের হয়ে যাবেঃ মুসলিম ১৩২-৩৪

এই হলো হাদিসের শিক্ষা। পাতায় পাতায় আলোর ঝলকানি। চাইলে এ তালিকা আরও লম্বা করতে পারি। প্রশ্ন হলো, এ ধরনের বাণী কোনো মহামানবের মুখ থেকে নিঃসৃত হতে পারে কি না? আমার পক্ষে তো বুদ্ধি ও বিবেককে ফাঁকি দেয়া সম্ভব নয়। হাদিস মিথ্যা বা বানোয়াট, এ দাবি এখানে করছি না; কিন্তু চোখ বুজে হাদিস বিশ্বাস করে যে গিরগিটি হত্যা করার মানুষ আমি নই, তা পাঠকদের অনুধাবন করা দরকার।

৩১.

ইসলামী বইমেলা হলো ডায়াবেটিস রোগীদের কাছে চিনি বিক্রি করার মেলা। রক্তে পর্যাপ্ত গ্লুকোজ থাকার পরও কেউ যদি চিনি কিনতে দোকানে যায়, তাহলে সেটিকে ব্যাধির আলামত ধরতে হবে। স্বাস্থ্যের নয়। যারা বইমেলাকে ধর্মীয় কিতাবমেলা মনে করে, তারা বই কী, বা বই কী উদ্দেশ্যে পড়া হয়, সে সম্পর্কে কিছু জানে বলে মনে হয় না। মেলা মানেই

বৈচিত্র্য। যে-মেলায় বৈচিত্র্য নেই, সে-মেলা কলকজ্জা বা লেদমেশিনের দোকান হতে পারে, কিন্তু তা মেলা নয়। কোথাও বইয়ের মেলা হচ্ছে, আর সেখানে বইয়ের বদলে বিক্রি হচ্ছে কেবল বেহেশতে যাওয়ার ম্যানুয়াল– এমন কল্পনা কুৎসিত। পাগলামোকে স্বাভাবিক আচার বলার সুযোগ নেই। যারা মানুষের ধর্মীয় আবেগকে পুঁজি করে সেকেণ্ডারি লিটারেচারের ব্যবসা করছেন, ভুঁইফোঁড় ধর্মসাহিত্য উৎপাদন করছেন, তারাই এসব মেলার উদ্যোক্তা। মাদ্রাসার অবুঝ কিশোরদেরকে এগুলোর খদ্দের বানানো হচ্ছে। তরুণরা বিভ্রান্ত হয়ে তালা মেরে রাখছে মগজে। একই স্বাদের চিনি খেয়ে খেয়ে মন মেদবহুল হয়ে পড়ছে। ভিন্ন চিন্তা ও ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে তাদের পরিচয় ঘটছে না। দোয়া, দরুদ, হাদিস, তাফসির, এসবের বাইরে আর কোনো বইয়ের কথা কল্পনা করতে পারছে না। নানা অপযুক্তি ও অপগল্পের বইকে ভাবা হচ্ছে জ্ঞানের বই। ইসলামী বটগাছ যেমন হাস্যকর, তেমনি কৌতুককর হলো ইসলামী বইমেলা। গাছ ও বইয়ের কোনো ধর্ম হয় না। কোরান কি মুসলিম? বাইবেল কি খ্রিস্টান? ত্রিপিটক কি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছে? করে নি। তাহলে বইয়ের হাতে ধর্মীয় পাসপোর্ট তুলে দেয়ার অর্থ কী? মানুষ কি চায়, পৃথিবীতে দিকে দিকে দেখা দিক হিন্দু বইমেলা, ইহুদি বইমেলা? যদি না চায়, তাহলে ইসলামী বইমেলাও আমাদের চাওয়া উচিত নয়।

৩২.

না, আমি আল্লাহকে ভয় পাই না। কারণ আল্লাহর সাথে আমার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। আল্লাহকে ভয় পাবে তারা, যাদের সাথে আল্লাহর দূরত্ব আছে। আমার সাথে তো আল্লাহর কোনো দূরত্ব নেই। আমি কি আল্লাহর নাম বিক্রি করে দুনিয়াতে চলছি? আল্লাহর নামে আজেবাজে বই রচনা করছি? তাঁর পক্ষে লাঠিসোটা বৃদ্ধি করছি? তাহলে আমি কেন আল্লাহকে ভয় পাবো? যারা আল্লাহর দোহাই দিয়ে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করছে, মাইকে বানোয়াট কথাবার্তা বলছে, দলবাজি করছে, শিক্ষককে জুতোর মালা পরাচ্ছে, তারাই আল্লাহকে ভয় পাচ্ছে।

আল্লাহভীরুগণ আমার সাথে একমত পোষণ করবে, এমনটি আশা করি না; কারণ তারা আল্লাহর বান্দা, আর আমি বন্ধু। বান্দা ও বন্ধুর চিন্তাপদ্ধতি এক নয়। মানুষ আল্লাহর বন্ধু হতে পারবে না, শুধু গোলাম হতে পারবে– এটি খুব আপত্তিকর কথা। মানুষকে আল্লাহর বন্ধু হওয়ার সাহস অর্জন করতে হবে। কারণ ভয় ও গোলামী নিষ্ঠুরতার প্রধান উৎস।

৩৩.

ইন্টেরনেট সেলেব্রিটিরা তরুণদের জীবনীশক্তি খেয়ে ফেলছে। অত্যন্ত গৌণ মানুষরা এখানে তরুণদের নবী। কোথাও কোনো বটবৃক্ষ নেই। সর্বত্র শুধু দোকানদার। কারও ছায়ায় বসে মাথা ঠাণ্ডা করা যাবে, বা শান দেয়া যাবে বোধের ছুরিকায়, এমন আশা নেই। সবাই মাথা নত করে আছে মোবাইল স্ক্রিনে। রাস্তায় বেরোলেই হাজার হাজার মানুষ, কিন্তু কেউ কারও সাথে কথা বলছে না। মনে হচ্ছে কোনো কালেক্টিভ ইনস্যানিটি আমাদেরকে গ্রাস করে ফেলেছে। যেন এ এক আছরুল জুনুন বা অপ্রকৃতস্থতার যুগ।

৩৪.

সাহিত্য লিখে অমর হওয়া যায়, এমনটি মনে করি না। লেখার জন্য ভাষা দরকার। ভাষার মেয়াদ আছে। বেয়াউলফ তো ইংরেজিতে লেখা, কিন্তু সে-ইংরেজি কি এখন ইংরেজরা বোঝে? বুঝে না। এক ইংরেজিকে আরেক ইংরেজিতে অনুবাদ করে পড়তে হচ্ছে। যদি বলা হয়– Hwaet, we Gardena in geardagum, peodcyninga– তাহলে সবাই ফ্যালফ্যাল চোখে তাকাবে, কিন্তু যদি বলি– So, the Spear-Danes in days gone by, and the kings who ruled them had courage and greatness– তাহলে বুঝে যাবে অনেকেই। জেফ্রি চসার সেদিনের মানুষ, মাত্র ৬০০ বছর আগে ক্যান্টারবারি টেইলস লিখেছিলেন। অথচ তাঁর সৃষ্টিকর্ম ইতোমধ্যে দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছে। সাধারণ পাঠকরা সেগুলো পড়তে পারছে না। ছাত্ররা

crulle, parfit, verray, endite, hem, namo– এসব শব্দ দেখে ভড়কে যাচ্ছে। চর্যাগীতির ভাষা আমরা ভুলে গেছি। নিসিঅ অন্ধারী মুসার চারা– এ পংক্তি এখন কারও মাথায় ঢুকবে না। কেবল 'নিশীথ আঁধারে মূষিকের বিচরণ'– এমন করে লিখলেই মানুষ বুঝতে পারবে। কোরানের অনেক শব্দ ও আয়াতের অর্থ নিরক্ষর আরবরা বুঝে না। কারণ আধুনিক কথ্য আরবির সাথে দেড় হাজার বছর আগের আরবির মিল নেই। গিলগামেশ যদি ইংরেজিতে অনূদিত না হতো, তাহলে কি আকেডিয়ান ভাষায় আমরা তা পড়তাম? পড়তাম না। এর মানে কী দাঁড়ালো? এর মানে, সময় ভাষাকে খেয়ে ফেলে। ভাষা মারা গেলে সাহিত্যও মারা যায়। সে-হিশেবে, আমি বা শেক্সপিয়ার, কারও আয়ুই অনন্তকাল নয়। যে-বাক্যগুলো উপরে লিখলাম, তার কোনো শব্দই একদিন মানুষ বুঝবে না।

৩৫.

যখন পেটে বিদ্যা ছিলো, কিন্তু মাথায় মগজ ছিলো না, তখন যেখানে-সেখানে বানান ভুল খুঁজে বেড়াতাম। কেউ মরণকে মরন লিখলে ক্ষেপে উঠতাম, চাকরিজীবীকে চাকরিজীবি লিখলে ভেঙে পড়তাম। ভাবখানা এমন, যেন বানান দেখভালের জন্য রাষ্ট্র একটি আলাদা থানা প্রতিষ্ঠা করেছে, আর আমাকে ওই থানার প্রধান দারোগা নিয়োগ দেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে যখন বিদ্যার সাথে বুদ্ধির সংযোগ ঘটলো, জ্ঞানের সাথে প্রজ্ঞার মিলন হলো, তখন এ রোগ কেটে গেলো। দেখা গেলো, বানানের চেয়ে বাক্য ও চিন্তা মুখ্য হয়ে উঠেছে।

৩৬.

ছোটবেলায় শুনেছিলাম, আরজ আলী মাতুব্বর বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরির সমস্ত বই পড়ে শেষ করে ফেলেছেন। খবরটি আমার জন্য অত্যন্ত প্রেরণাদায়ক ও সমীহ-জাগানিয়া ছিলো। কিন্তু বড় হয়ে বুঝলাম, বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরিতে বইপত্র বিশেষ ছিলো না। একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি স্পষ্ট হবে। যেমন, জনাব মাতুব্বর তাঁর বইয়ের এক

জায়গায় তিনটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, যা পড়লে পাঠকদের ভেতর হতবিহ্বলতা তৈরি হয়। প্রশ্নগুলো এরকম:

(ক) ঈশ্বর স্থানকে সৃষ্টি করেছেন কোন স্থানে বসে?
(খ) ঈশ্বর শক্তিকে সৃষ্টি করেছেন কোন শক্তি দ্বারা?
(গ) ঈশ্বর সময়কে সৃষ্টি করেছেন কোন সময়ে?

তিনটি প্রশ্নই সাক্ষ্য দেয়, আরজ আলী মাতুব্বর আধুনিক দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে তেমন কিছু জানতেন না। তাঁর এপিস্টেমোলোজিক্যাল জ্ঞানও সীমিত ছিলো।

মাতুব্বরের তিনটি প্রশ্নই প্রি-সাপোজিশন ফ্যালাসিতে ভরপুর। তিনি ধরেই নিয়েছেন:

(১) স্থান সৃষ্টি করতে স্থান লাগে; (২) শক্তি সৃষ্টি করতে শক্তি লাগে; (৩) সময় সৃষ্টি করতে সময় লাগে; (৪) সময় একটি সৃষ্টিযোগ্য জিনিস; (৫) ঈশ্বরের স্থান, সময়, ও শক্তি সৃষ্টি করার ক্ষমতা আছে; (৬) স্থান-কালে অবস্থান না করে কোনোকিছু সৃষ্টি করা যায় না; (৭) ঈশ্বর একজন ইন্টারভেনশোনিস্ট পার্সোনালিটি।

এ ছাড়া সময়, স্থান, শক্তি, পদার্থ, এগুলো যে ফিজিক্যাল ও অ্যাবসোলিউট সাবস্টেন্স না হয়ে মেন্টাল, আইডিয়াল, বা এমার্জেন্ট ফেনোমেনাও হতে পারে, এরকম কোনো সম্ভাবনাও তিনি মাথায় রাখেন নি।

ফলে মনে হচ্ছে, আরজ আলী মাতুব্বরের দার্শনিক কৌতূহল থাকলেও দার্শনিক দক্ষতা ছিলো না। একজন আধুনিক দার্শনিক এতো দুর্বলভাবে চিন্তা করেন না। যাদের চিন্তাভাবনা ডগম্যাটিক, তাদের ক্ষেত্রে প্রি-সাপোজিশন ফ্যালাসি বেশি ঘটে। ধর্মসৈনিকদের বইপত্রে তো প্রি-সাপোজিশন ফ্যালাসি মহামারি আকার ধারণ করেছে।

তবে আরজ আলী মাতুব্বরের জানার স্পৃহা, তাঁর একলা চলার উদ্যম, নিজেকে প্রকাশ করার শক্তি, প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানোর ক্ষমতা, এ গুণগুলোকে আমি শ্রদ্ধা করি। তিনি বাংলাদেশের প্রথম কৌতূহলী মানুষ, যিনি বেশ ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর বিষয়ে অকপটে প্রশ্ন তুলেছিলেন। লেখক হিশেবেও তিনি প্রভাবশালী। তাঁর লেখা 'শয়তানের জবানবন্দী' একটি অসাধারণ রচনা।

৩৭.

বাংলাদেশ বা ভারতবর্ষের মানুষের চিন্তা করার ক্ষমতা পশ্চিমাদের চেয়ে কম, এমনটি মনে করি না। অ্যারিস্টোটলের কথাই ধরা যাক। অ্যারিস্টোটোলিয়ান লজিকের প্রধান বৈশিষ্ট্য– এর এপ্রোচ টু নেগেশন দ্বিপৃষ্ঠ বা বাইনারি। অর্থাৎ অ্যারিস্টোটলের কাছে কোনো স্টেইটম্যান্ট হয় 'সত্য', না হয় 'মিথ্যা'। এ দুইয়ের বাইরে আর কোনো থ্রুদ ভ্যালু নেই।

এই বাইনারি লজিক দিয়ে আমরা শ্রোডিঞ্জারের বিলাই বা কোয়ান্টাম সুপারপজিশন ব্যাখ্যা করতে পারবো না। কিন্তু ভারতবর্ষের লজিক দিয়ে পারবো। অ্যারিস্টোটলের অনেক আগে, ভারতবর্ষে টেট্রালেমা বা চতুষ্কোটি যুক্তিবিদ্যার জন্ম হয়েছিলো। চতুষ্কোটিতে কোনো স্টেইটম্যান্টের থ্রুদ ভ্যালু থাকে চারটি, যথা– (ক) সত্য, (খ) মিথ্যা, (গ) একইসাথে সত্য ও মিথ্যা, এবং (ঘ) সত্য ও মিথ্যা কোনোটিই নয়।

এ যুক্তিবিদ্যা মানুষের কল্পনার পরিধি বাড়িয়ে দিচ্ছে, কারণ এর এপ্রোচ টু নেগেশন চারপৃষ্ঠ বা ফোরফোল্ড। ফলে বলতে পারি, এটি অ্যারিস্টোটোলিয়ান লজিকের চেয়ে অগ্রসর।

কোয়ান্টাম সুপারপজিশনে কী ঘটে? কোনো কোয়ান্টাম সিস্টেম একই সময়ে একাধিক অবস্থা বা স্টেইটে বিরাজ করতে পারার ঘটনাই কোয়ান্টাম সুপারপজিশন। যেমন ইলেকট্রন। এটি একইসাথে কণা ও তরঙ্গের ন্যায় আচরণ করতে পারে। এই যে ওয়েভ-পার্টিকল ডিওয়ালিটি, এর স্থান অ্যারিস্টোটলে নেই। অ্যারিস্টোটোলিয়ান লজিকে ইলেকট্রন হয় কণাধর্মী,

না হয় তরঙ্গধর্মী। কিন্তু চতুষ্কোটি যুক্তিবিদ্যায় কোনো জিনিসের একইসাথে একাধিক অবস্থায় থাকার সুযোগ আছে। বিলাই একইসাথে মৃত ও জীবিত, এটি চতুষ্কোটিতে সম্ভব। অ্যারিস্টোটলে সম্ভব নয়।

ধরা যাক,
ইলেকট্রন একপ্রকার কণাধর্মী জিনিস = A
ইলেকট্রন একপ্রকার তরঙ্গধর্মী জিনিস = $B = \neg A$
ইলেকট্রন কণা ও তরঙ্গ উভয়ধর্মী জিনিস = $A \land B = A \land \neg A$
ইলেকট্রন কণাধর্মীও নয়, তরঙ্গধর্মীও নয় = $\neg (A \lor B) = \neg (A \lor \neg A)$

আরও ধরা যাক, কোনো কোয়ান্টাম সিস্টেম দুই বা ততোধিক সম্ভাব্য অবস্থার লিনিয়ার কম্বিনেশনে আছে। যদি প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থার স্টেইট ভেক্টর $|\psi_1\rangle$ এবং $|\psi_2\rangle$ হয়, তাহলে দুটি অবস্থার সুপারপজিশন হবে:

$$|\Psi\rangle = \alpha |\psi_1\rangle + \beta |\psi_2\rangle$$

যা মূলত $A \land B$

এখানে কিছু নতুন সম্ভাবনা উঁকি দেয়। ইলেকট্রন ও অন্যান্য কোয়ান্টাম-মেকানিক্যাল জিনিসগুলো এমন কোনো অবস্থায় থাকতে পারে কি না, যে-অবস্থাটি কণাধর্মীও নয়, তরঙ্গধর্মীও নয়, আবার এ দুই অবস্থার সুপারপজিশনও নয়? অর্থাৎ $\neg(A \lor B)$ বা $\neg(A \land B)$ অবস্থার সম্ভাবনাটুকুও যাচাই করা দরকার।

আমি বলছি না যে বৌদ্ধ পণ্ডিতরা আধুনিক কোয়ান্টাম মেকানিক্সের স্টেইট ভেক্টর বা ওয়েভ-ফাংশন সম্পর্কে জানতেন, কিন্তু তারা যে সমকালীন পশ্চিমা পণ্ডিতদের চেয়ে চিন্তাভাবনায় খুব একটা পিছিয়ে ছিলেন না, বা জ্ঞানচর্চার একটি স্রোত যে প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষেও চালু ছিলো, এটিই বলতে চাচ্ছি।

৩৮.

কামিউনিকেশন স্কিল মূলত প্রতারণা করার স্কিল। কিছু সত্য গোপন রেখে, কিছু সত্য প্রকাশ করে, সাদামাটা জিনিসকে আকর্ষণীয় বচন ও ভঙ্গিতে উপস্থাপনের মাধ্যমে মতলব হাসিলের দক্ষতাই কামিউনিকেশন স্কিল। আধুনিক কর্পোরেশন ও সরকারযন্ত্রগুলো এ স্কিলের উপরই টিকে আছে। আবুলের কামিউনিকেশন স্কিল ভালো, এর অর্থ হলো– আবুল ক্যান হাইড দা ট্রুথ নাইসলি।

নোট: নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষমতা বা সেলফ-এক্সপ্রেসন স্কিলের সাথে কামিউনিকেশন স্কিলের পার্থক্য আছে। তরুণদের উচিত সেলফ-এক্সপ্রেসন স্কিলে মনোযোগ দেয়া। কারণ 'কামিউনিকেশন স্কিল' কথাটির মূল অর্থ পাল্টে গেছে। এটি এখন একপ্রকার অস্ত্র, এবং অস্ত্রটি সমাজের জন্য শুভ নয়। ধুরন্ধর সংঘ ও কর্পোরেশনগুলো এ অস্ত্রের প্রধান সুবিধাভোগী।

৩৯.

কোনো জাতির শ্রেষ্ঠত্ব মিলিটারি শক্তি দিয়ে নির্ধারিত হওয়া উচিত নয়। বুদ্ধি, শিক্ষা, উদ্ভাবনশীলতা, চাঁদে যাওয়া– এগুলো দিয়েও নয়। জাতির উৎকর্ষ নির্ধারিত হওয়া উচিত মায়া-মমতা দিয়ে। সে-জাতিই শ্রেষ্ঠ, যে-জাতি আপন-পর সব জাতিকেই মমতার চোখে দেখে। মার্কিনিরা শক্তিশালী জাতি, এ বিচার হাইড্রোজেন বোমার সংখ্যা দিয়ে করবো না। বরং আমি দেখবো, তাদের ভাণ্ডারে পর্যাপ্ত মমতার বোমা আছে কি না, তা।

৪০.

সবকিছুর মানে খুঁজতে যাওয়া ঠিক নয়। গুলিস্তান শব্দের অর্থ গোলাপ বাগান। কিন্তু ওখানে কি গোলাপ বাগান আছে? নেই। বরং ময়লা ও পকেটমারের বাগানকেই বলা হচ্ছে গুলিস্তান। ভাষার চিত্রকল্পের সাথে

বাস্তবের চিত্রকল্প এ দেশে মেলে না। যিনি উপাসনা করেন শয়তানের, তিনি এখানে নাম ধারণ করে আছেন আব্দুল্লাহ! প্রতি বাক্যে মিথ্যে কথা বলেন, এমন লোকের নাম সাদেক হোসেন। নিরেট মূর্খ লোককে বলা হচ্ছে আল্লামা। সর্বশেষ কবে বই পড়েছেন বলতে পারবেন না, এমন মানুষের পদবী অধ্যাপক! ওভারলোড নিয়ে উল্টো লেনে চলছে, এমন ট্রাকের পেছনে লেখা– ট্রাফিক আইন মেনে চলুন। দিনরাত পেটের চাকরি করে ঘোষণা দিচ্ছে: আমি শিক্ষক। ওয়াজে মানুষ খুনের ফতোয়া দিয়ে লিখছে– ইসলাম শান্তির ধর্ম। অর্থাৎ সবকিছুতে একটি উল্টো গ্রহ লেগে আছে। কোনোকিছুই আর সঠিক অর্থ প্রকাশ করছে না।

৪১.

পুরস্কার একপ্রকার দড়ি, যা দিয়ে টেনে টেনে লেখকদেরকে গোয়ালঘরে ঢোকানো হয়।

৪২.

একটি দ্বীপের ভার আমি সবসময় বুকে বয়ে চলি। দীঘির জলে রোদে কাঁপতে থাকা তালপাতার মতো দ্বীপটি আমাকে ডাকে। দ্বীপটিকে আমার চেনাই মনে হয়। ওই অগ্নিমণ্ডলেই আমি জন্মেছিলাম। ওখানেই সর্বশেষ দেখা গিয়েছিলো আমাকে মানুষ রূপে। তারপর রূপান্তর ঘটে গেছে। শরীরের ভেতর দেখা দিয়েছে আরেক শরীর। ভার্জিলের হার্পিদের মতো দেখতে সে-শরীর আমার নয়। কেউ কৌশলে আমার ভেতর তা ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে। দ্বীপটিতে খুব যাবার ইচ্ছে হয়। কী করছে দ্বীপটি, কতোখানি পচেছে তার গর্ভাশয়, তা জানার সাধ হয়। দ্বীপটির কি মনে আছে আমার কথা? থাকার কথা নয়। সম্ভবত তাকেও গ্রাস করেছে দুরারোগ্য রাষ্ট্র। রাষ্ট্র ও ব্যাধি কি এখন সমার্থক? দীর্ঘদিন দ্বীপটির আমি কোনো খবর পাই না। কোনো পাখিকে উড়ে আসতে দেখি না তার আকাশ থেকে। মনে হয় সে বেছে নিয়েছে নিঃসঙ্গ মুনির জীবন। নির্জন বৃক্ষের মতো বেড়ে উঠছে গহিন জঙ্গলে। আমি দ্বীপটিকে এক ঝলক দেখতে পাই। সে লাঠি ভর করে

এগিয়ে আসছে। ডাকাত-পড়া পাড়ার মতো নিঃস্ব দেখাচ্ছে তাকে। তার সোনার ঘর লুট হয়ে গেছে। রূপোর ঢিবি ফাঁকা পড়ে আছে। তার দইগল বাঘাটিয়া উমের ডুপি উড়ে চলে গেছে। দ্বীপটি আমাকে চিনতে পারে না। ডাকাত ভেবে বারবার দূরে সরতে থাকে।

৪৩.

কোনো মানুষ ন্যায়বিচার বা ফেয়ার ট্রায়ালে বিশ্বাস করে কি না, তা বুঝার সহজ উপায় হলো, লোকটি ঐতিহাসিক খলনায়কদের ব্যাপারে কী মনোভাব পোষণ করে, তা জানা। আবু জাহেলের কথাই ধরি। ভদ্রলোকের আসল নাম আমর ইবনে হিশাম। প্রায় একশো কোটি মানুষ বিশ্বাস করে, আবু জাহেল একজন খারাপ লোক। প্রশ্ন হলো, তারা কীভাবে জানে যে আবু জাহেল খারাপ লোক? স্পষ্টত, আবু জাহেল যাদের হাতে পরাজিত হয়েছিলেন, তাদের বক্তব্য শোনে। অর্থাৎ আপনার শত্রুর কথা শুনে আমি আপনাকে বিচার করছি। আপনার কোনো বক্তব্য জানার প্রয়োজন বোধ করছি না। এই যে কেবল এক পক্ষের কথা শুনে মানুষ সম্পর্কে মতামত দাঁড় করিয়ে ফেলা, সেটিকে কি ন্যায়বিচার বলা যায়? যায় না। ন্যায়বিচার হলো তা, যেখানে চিয়াং কাই শেককে নির্ভয়ে মাও জেদংয়ের বিরুদ্ধে কথা বলতে দেওয়া হয়। কোনো আদালতে ফেরেশতাদের চরিত্র সম্পর্কে শয়তানকে কথা উপস্থাপনের সুযোগ দেয়া না হলে, তা ন্যায়ের আদালত হয় না। কেবল ফেরেশতা বা মহাপতঙ্গের কথা শুনে শয়তানকে অনিষ্টকারী বলা ন্যায়বিচারের লক্ষণ নয়। মহাপতঙ্গের লেখা বইয়ে মহাপতঙ্গের যে-চরিত্র পাই, শয়তানের লেখা বইয়ে মহাপতঙ্গের সে-চরিত্র পাবো বলে মনে হয় না।

৪৪.

যারা কৃমি হয়ে শুষে নিলো তোমার সমস্ত পুষ্টি, ধেড়ে ইঁদুরের মতো সাবাড় করলো ফসল, তাদের মুখমালা তুমি প্রকাশ করো। তুমি সুস্থ হও, তুমি সুস্থ হলেই আমি সুস্থ হয়ে উঠবো। তোমাকে লাশ ভেবে চারদিকে উৎসব শুরু

হয়ে গেছে। দিগন্তে হৈ হৈ পড়ে গেছে। বিমানে চেপে হাজার মাইল দূর থেকে আসছে শৃগালেরা। তোমার উরুতে ফোঁড়ার মতো দেখা দিয়েছে আইনের মন্দির। তুমি বাস করছো গ্যাবলের তলায়, তোমাকে করুণা করছে সার্ভেইল্যান্স ডিভাইস। তুমি অরণ্যে উৎসবের পশু, কসাইয়ের ছুরিকার নিচে বিনীত ষাঁড়ের মতো অসহায়। তোমার চাঁদ ঢেকে গেছে তুষারে। রবিজী অস্তগামী। ভর দুপুরে শিকার হয়ে উঠেছো অমাবস্যার। তুমি আমার বাকবাকুম পায়রা মাথায় দিয়ে টায়রা, নীলশির জালালী কবুতর, চোতের ঘুঘু, আশ্বিনের চিল, দশের নামতা, তুমি নীরোগ হয়ে ওঠো। তুমি নীরোগ হলে আমরা আর ঢাকা যাবো না। তুমি হাসলে, ঘাসের ডগায় পুনরায় কেঁদে উঠবে শিশির।

৪৫.

মুসলিম রাষ্ট্র, হিন্দু রাষ্ট্র, ইহুদী রাষ্ট্র, এ ধরনের শব্দ 'রাষ্ট্র' ধারণার জন্য ক্ষতিকর। রাষ্ট্র যদি ধার্মিক হয়ে ওঠে, আর রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো যদি উপাসনালয়ের মতো আচরণ করে, তাহলে নাগরিকের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। 'আমি নাগরিক'– এ পরিচয়ের চেয়ে 'আমি খ্রিস্টান', 'আমি বৌদ্ধ', 'আমি নাস্তিক', 'আমি মার্ক্সিস্ট'– এমন পরিচয় তখন মুখ্য হয়ে ওঠে। আইনের স্থান দখলে নিতে শুরু করে ধর্মসেনাদের হুকুম ও ফতোয়া। অস্টিন বা ডোর্কিনের চেয়ে আয়াতুল্লা খোমেনিদের কথা আদালতে অধিক প্রভাব বিস্তার করে। ধর্মগ্রন্থে'র সাথে সাংঘর্ষিক, এমন বিষয়াদিতে স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণা ধীরে ধীরে লোপ পায়। জ্ঞান-বিজ্ঞানে দেখা দেয় স্থবিরতা। মানুষের রাজনীতিক বিকাশ স্তিমিত হয়ে পড়ে। সমাজ থেকে আনন্দ-উল্লাস উধাও হয়ে যায়। উৎসব হয়ে ওঠে একদলীয় প্রার্থনামঞ্চ। শিক্ষা হয়ে ওঠে ধর্মগ্রন্থে'র একঘেয়ে সবক। মানুষের ন্যাচারাল রাইটস বা স্বাভাবিক অধিকারগুলো সংকুচিত হতে থাকে। সমাজ রূপ ধারণ করে ধর্মীয় কোতোয়ালী থানার। চর্চা ও রসদের অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয় স্থানীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। শিশুদের মনে ঢুকতে থাকে একের পর এক ভয়ের বীজ। যখন এ বীজ অঙ্কুরিত হয়, তখন রাষ্ট্র হয়ে ওঠে প্রকাণ্ড ধর্মগহ্বর। কৃষ্ণগহ্বরের সাথে ধর্মগহ্বরের পার্থক্য হলো– কৃষ্ণগহ্বরে

আলো ঢুকতে পারে, কিন্তু বের হতে পারে না। আর ধর্মগহ্বর থেকে আলো বের হতে পারলেও, কোনো নতুন আলো ঢুকতে পারে না।

৪৬.

(ক)

ইতিহাস আর 'শোনা কথা' এক জিনিস নয়। শোনা কথা চকচকে ও কানোত্তেজক। এটি হৃদয়কে হাইজ্যাক করতে পারে মুহূর্তেই। অপছন্দের জাতি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মনকে বিষিয়ে তুলতে পারে সহজেই। উদাহরণ স্বরূপ আল-আকসা মসজিদের কথা বলা যায়। ইতিহাস বলে, মসজিদটি যে-স্থানে আছে, সে-স্থানে খ্রিস্টপূর্ব দশম শতকে রাজা সলোমন একটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। এটিকে মানুষ ডাকে 'ফার্স্ট টেম্পল' নামে। খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৬ সালে ব্যাবিলনীয়রা এই ফার্স্ট টেম্পল ধ্বংস করে ফেলে। পরবর্তীতে রাজা সাইরাস দ্য গ্রেটের সময়ে, খ্রিস্টপূর্ব ৫১৬ সালে, জেরুব্বাবেলের নেতৃত্বে ইহুদীরা মন্দিরটি পুনরায় নির্মাণ করে। এই পুনঃর্নির্মিত নতুন মন্দিরটিকে ইতিহাসবিদরা ডাকেন 'সেকেন্ড টেম্পল' নামে। খ্রিস্টপূর্ব ৭০ সালে রোমান সেনাপতি টাইটাস যখন জেরুজালেম অবরোধ করেন, তখন রোমান সেনারা সেকেন্ড টেম্পল আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। ফলে মন্দিরটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। তারপর কয়েকশো বছর ওই স্থানে আর নতুন কোনো উপাসনালয় কেউ নির্মাণ করে নি। ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে খলিফা ওমর যখন জেরুজালেম জয় করেন, তখন তিনি দেখতে পান– 'ফার্স্ট টেম্পল' বা 'সেকেন্ড টেম্পল'-এর স্থানটি, অর্থাৎ টেম্পল মাউন্ট এলাকাটি, খালি পড়ে আছে। মৃদুমন্দ ধ্বংসস্তূপ ছাড়া ওখানে কিছু নেই। এতে ভদ্রলোক খুব অবাক হন। কারণ তিনি আশা করেছিলেন, সেখানে একটি সুন্দর ও বড় মসজিদ থাকবে। মেরাজের ঘটনায় এমনটিই বলা আছে। ইসলামী বিশ্বাস অনুযায়ী, নবী বুরাকে চড়ে ওখানে গিয়েছিলেন। আশাহত ওমর করলেন কী, তিনি নিজেই কাঠ দিয়ে একটি সাধারণ ও মোটামুটি মানের মসজিদ নির্মাণ করলেন। ইতিহাস বলে, এটিই জেরুজালেম বা টেম্পল মাউন্ট এলাকায় প্রথম মসজিদ। মুসলমানদের আগমনও এই প্রথম। এর আগে ওখানে মুসলিম বসতি ছিলো না। তবে ইহুদীদের বসতি ছিলো আদিকাল থেকেই।

প্রশ্ন হলো, ওই এলাকা বা মসজিদটি নিয়ে মুসলমানদের একটি অংশ এতো আবেগপ্রবণ কেন? এ প্রসঙ্গে কোরানের একটি আয়াত পড়তে চাই:

সুবহানাল্লাজি আসরা বি'আবদিহী লাইলাম মিনাল মাসজিদিল হারামি ইলাল মাসজিদিল আকসাল-লাজি বারাকনা .. .. ।

এ আয়াতে নবীকে মেরাজের রাতে মক্কার মসজিদ আল-হারাম থেকে জেরুজালেমের মসজিদ আল-আকসায় নেয়ার কথা বলা হয়েছে। মসজিদ আল-আকসা কী? মসজিদ আল-আকসা কথাটির অর্থ হলো– বহু দূরের মসজিদ, বা সবচেয়ে দূরের মসজিদ। কারণ মক্কা থেকে জেরুজালেম ছিলো বহু দূরের পথ।

মেরাজ কতো সালের ঘটনা? ৬২১ সালের। নবী মারা যান কতো সালে? ৬৩২ সালে। খলিফা ওমর জেরুজালেম জয় করেন কতো সালে? ৬৩৭ সালে। অর্থাৎ মেরাজের রাতে নবীকে আল আকসা নামের যে-মসজিদে নেয়ার কথা বলা হয়েছে, সে-মসজিদটি খলিফা ওমর, মেরাজের মাত্র ১৬ বছর পরে গিয়েও খুঁজে পান নি। নবীর মৃত্যুর পাঁচ বছর পর যে-মসজিদ খুঁজে পাওয়া যায় না, সে-মসজিদ নবীর সময়ে ওখানে ছিলো, তা কল্পনা করা সহজ হলেও, ঐতিহাসিক সত্য হিশেবে প্রতিষ্ঠা করা কঠিন। হ্যাঁ, 'উইশফুল থিংকিং'-কে বাস্তবে রূপ দিতে ওখানে মসজিদ কম্পাউন্ড তৈরি করা হয়েছে, এবং সেটিকে মসজিদ আল-আকসা নামে ডাকাও হচ্ছে, কিন্তু এটির জন্য জান-প্রাণ দিতে হবে– এমন মনোভাব বিশ্বশান্তির জন্য ক্ষতিকর।

(খ)

এ অংশটি স্পর্শকাতর, বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় ছাপানো গেলো না ##। এসব ঘটনা ইঙ্গিত দেয়– ওই স্থানে একটি মসজিদ থাকুক, ## এ লাইনটি স্পর্শকাতর, বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় ছাপানো গেলো না

৪৭.

এলিট কারা, তা জানার আগে এলিটিজম কী– তা বোঝা জরুরি। এলিটিজম হলো মানুষ ও প্রতিষ্ঠানের ওইসকল গুণাবলী, যা গরিবরা আয়ত্ত করতে চায়, কিন্তু সহজে পারে না। এলিটিজম কোনো ঘৃণ্য জিনিস নয়। বরং এটি সমাজ ও সংস্কৃতির সেই কাঙ্ক্ষিত স্তর, যা স্পর্শ করার স্বপ্ন সব গরিবই দেখে। চাষীর ছেলে চাষী হলে চাষী খুশি হয় না। সে দুঃখ পায়। কারণ চাষার জীবন তার কাঙ্ক্ষিত জীবন নয়। বাংলাদেশে চাষীরা গরিব (যেহেতু অর্থ না থাকাকেই এ দেশে গরিবি বলা হয়)। এ জন্য চাষীর ছেলে যখন ভালো কোনো প্রতিষ্ঠানে পড়ার সুযোগ পায়, বা ক্ষমতাধর কোনো পদে চাকরি পায়, তখন তা পত্রিকার শিরোনাম হয়।

চাষার জীবন কি এলিট জীবন? না, তা নয়। এলিট জীবন তা, যা মানুষ যাপন করতে চায়। কোনো চাষী এখানে চাষার জীবন চায় না। সন্তানকে তারা যখন ইশকুলে পাঠায়, তখন জীবন পরিবর্তনের আশা থেকেই পাঠায়। প্রতিটি চাষীর সন্তান ইশকুলকে জীবন পরিবর্তনের প্ল্যাটফর্ম মনে করে। দুস্থ, পীড়িত, ভাঙারি জীবন ত্যাগ করে তারা প্রবেশ করতে চায় এমন জীবনে, যে-জীবন দেখে প্রতিবেশী চাষীরা আফসোস করবে। লুঙ্গি কেন এলিট পোশাক নয়? কারণ চাষী, শ্রমিক, মুট-মজুর, তাদের চোখে লুঙ্গি একটি অনাকাঙ্ক্ষিত জীবনের প্রতীক। সিম্বল অব অ্যান আনওয়ান্টেড লাইফ। মন্ত্রী এখানে চাষী হতে চায় না, তবে চাষী মন্ত্রী হতে চায়। এ জন্য মন্ত্রী এলিট, চাষী এলিট নয়। অমুক বিশ্ববিদ্যালয় এলিট বিশ্ববিদ্যালয়, এর অর্থ কী? এর অর্থ হলো, ছাত্ররা অমুক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চায়। করিমোদ্দৌলা এলিট লেখক, এর মানে– অন্যরা করিমোদ্দৌলার মতো লিখতে চায়। এলিট সঙ্গীত, এলিট শিল্পকলা, এলিট সাহিত্য, এলিট দর্শন, এগুলো সংস্কৃতির ওই এলাকা, যে-এলাকায় সমাজের অধিকাংশ লোক যেতে চায়।

৪৮.

আমার মনে হয় না এ দেশে জ্ঞানের কদর আছে। ## এ নামটি স্পর্শকাতর, বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় ছাপানো গেলো না ## আমার চেয়ে কম জ্ঞানী, কিন্তু আমাদের প্রধান ## এ নামটি স্পর্শকাতর, বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় ছাপানো গেলো না ## তার নামে। আমি না হয় বাদ গেলাম, সত্যেন বোস বা জগদীশচন্দ্রের নামেও যদি ## এ নামটি স্পর্শকাতর, বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় ছাপানো গেলো না ## হতো, তাহলেও বলা যেতো- দেশটি জ্ঞানচর্চার মূল্য জানে। কিন্তু তা তো হচ্ছে না। উল্টো ধর্মচর্চাকে জ্ঞানচর্চা বলে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে।

৪৯.

আর আছে মুক্তিযুদ্ধ, কান পাতলেই শোনা যায় মুক্তিযুদ্ধ। সারাবছর কোথাও না কোথাও মুক্তিযুদ্ধ লেগেই আছে। এতো মুক্তিযোদ্ধা একাত্তরে ছিলো না। থাকলে ভালোই হতো; নয়মাস অনেকদিন, নয়দিনও লাগতো না। কিন্তু এখন আছে, এবং বাড়ছে। বন্যায় পানিও এতো দ্রুত বাড়ে না, যতো দ্রুত বাড়ে মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা। যে পালিয়ে ছিলো গর্তে, কিংবা মৌজে ছিলো বাংলার ওপারের বাংলায়, পৃথিবীতে বাংলার শেষ নেই; যার মুখে ছিলো সারাদিন জিন্দাবাদ, যে মর্ত্যে তো নয়ই, মায়ের পেটেও ছিলো না, সেও কালো কোট পরে পরিণত হয়েছে ভয়ানক মুক্তিযোদ্ধায়। এ অবস্থায়, যিনি সত্যিই যুদ্ধে গিয়েছিলেন, তাঁর পক্ষে আর নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা দাবি করা সম্ভব হয় না।

৫০.

রবীন্দ্রনাথ, আমাদের প্রথম কৃষ্ণগহ্বর, প্রথম পুশকিন, যিনি অবলীলায় শুষে নিতে পারেন বাঙালি লেখকদের সমস্ত আলো। ঋগবেদের ভাষায়- কবীনাং কবিতমঃ। শয়তান দীর্ঘকাল তাঁর সাথে যুদ্ধ করে আসছে, ফুঁ দিয়ে চলছে অবিরত, কিন্তু নেভাতে পারে নি। তিনি জ্বলছেন। জ্বালাচ্ছেন।

তাঁকে বাতিলের জন্য যমুনাপাড়ি ছাগলদের আয়োজনের শেষ নেই। তাঁর প্রথম অপরাধ, তিনি ধারণ করে আছেন এমন এক নাম, যা আরবি নয়। রবি, ইন্দ্র, ও নাথ, এ তিন আপত্তিকর ভারতীয় শব্দ তাঁকে করে তুলেছে আপন ঘরেও পর; বিশেষ এক গোষ্ঠীর কাছে। যদি নামটি আবু লায়লা আল মুহাল্লিল বা আমর ইবনে কুলসুমের মতো মধ্যপ্রাচ্যিক শোনাতো, তাহলে তাঁকে নিয়ে এতো কুৎসা বঙ্গভূমে ভেসে বেড়াতো না। যার সৃষ্টিকর্ম সমুদ্রের চেয়ে ছোট নয়, যার ভূমিকা বাংলা ভাষায় ওরকম, যেরকম সংস্কৃতে ছিলো কালিদাসের ভূমিকা, যিনি শিশুকালেই লিখেছিলেন– "মীনগণ দীন হয়ে ছিলো সরোবরে / এখন তাহারা সুখে জলে ক্রীড়া করে"– তাঁকে ইতরগণ স্বস্তরে নামাতে কতো কসরতই না করে চলছে! যার 'বেণু' বহন করছে স্মারক, বৈষ্ণব পদাবলীর; 'বাণী', মেঘদূতের; যিনি বাংলা ভাষার জন্য আহরণ করেছিলেন ছন্দ, জয়দেবের গীতগোবিন্দ থেকে, দাশরথির পাঁচালী গান থেকে; যিনি, বলা যায়, একাই সংস্কৃতের গ্রাস থেকে টেনেহিঁচড়ে উদ্ধার করেছিলেন বাংলা সাহিত্যকে, নির্মাণ করেছিলেন গদ্য ও পদ্যের নিজস্ব ভাষা, যা বাঙালি আজও ব্যবহার করছে সানন্দে, তাঁকে, বাংলাদেশের প্রধান ভাষানায়ককে, শয়তান বিচার করছে তাঁর হিন্দু ও কলকাতার পরিচয় দিয়ে। যিনি একদিনও ডুব দেন নি রবীন্দ্রপুকুরে, সাঁতার কাটেন নি একটি ঘণ্টাও রবীন্দ্রসমুদ্রে, তিনিও নিঃশঙ্কোচে আওয়াজ তুলছেন– "রবীন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি মুসলমানদের ভালো চাইতেন না।" যিনি ছিলেন শিল্পী, তাঁকে বাঙালি বিচার করলো বিপ্লবী হিশেবে। ভাষা ও চিন্তার কারিগরকে আমরা বানিয়ে ফেললাম রাজনীতিক কর্মী।

৫১.

জ্ঞানী মানুষ চুপচাপ মারা গেলে অনেকেরই সুবিধা হয়। পৃথিবীর একটি বড় সংকট হলো– এখানে অজ্ঞরা সরব, কিন্তু জ্ঞানীরা নিরব। যে-এলাকায় জ্ঞান নিরব থাকে, সে-এলাকায় অজ্ঞতার ঢোল বেশি বাজে। কারণ অজ্ঞরা সংঘবদ্ধ ও লজ্জাহীন। নিষ্ঠুরতার একটি বড় উৎস হলো– লজ্জাহীনদের সংঘবদ্ধতা।

৫২.

মাদ্রাসা খুব অদ্ভুত এলাকা। ওখানে শিক্ষা দেওয়া হয়, দরুদ শরীফ পড়লে সওয়াব আছে, কিন্তু অ্যারিস্টোটল পড়লে কোনো সওয়াব নেই।

৫৩.

বাঙালি সক্রেটিসের প্রশংসা করে। কিন্তু কাউকে সক্রেটিস হতে দেখলে তার গলা কাটতে আসে। অর্থাৎ সে চায়, সক্রেটিস সবসময় বিদেশে থাকুক।

৫৪.

একদল ভণ্ডলোক বের হয়েছে, যারা ধর্মের পক্ষ নেওয়াকে বলছে মজলুমের পক্ষ নেওয়া। মজলুম একটি সেকুলার শব্দ। মজলুমের কোনো জাত, বর্ণ, বা ধর্ম হয় না। মজলুমের পরিচয়– সে মজলুম। কিন্তু বঙ্গভণ্ডরা মজলুম বলতে বোঝে কেবল পছন্দের ধর্মের লোককে। জুলুমকারী বলতে বোঝে শুধু অপছন্দের ধর্মের মানুষকে। নিজ ধর্মের কেউ জুলুম করলে, সে নিরব থাকে। ভিন্ন ধর্মের কেউ পীড়িত হলে, তার চোখ বন্ধ থাকে। এই মুহূর্তে বিশ্বের অনেকগুলো দেশে সংঘাত চলছে। বহু অঞ্চল স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে। তারা সবাই শিকার হচ্ছে মর্মস্পর্শী খাদ্যসংকট, বেদনা, ও জুলুমের। কিন্তু ধর্মচোখী বঙ্গভ্যাক্সরা সরব কেবল বিশেষ কিছু ঘটনায়। যেন শিকারের শোকে ধর্মজীবী কুমিরগণ বিসর্জন দিচ্ছে তাদের মূল্যবান কুম্ভীরাশ্রু। প্রতিবাদ করার সময় তারা হিসেব করছে, যার পক্ষে দাঁড়াবো, সে আমার ধর্মের তো? যার বিপক্ষে চেচাবো, সে অন্য ধর্মের তো? বুদ্ধিজীবীদেরও একই হাল। বঙ্গমঞ্চে বুদ্ধিজীবী নাটকের যারা পরিচিত অভিনেতা, তারা বিশ্বাস করে– শ্রোতা হারানোর চেয়ে শির হারানো অধিক সম্মানের। বুদ্ধিজীবীতার আড়ালে শ্রোতাকুলের নর্তকী পদে চাকুরি করাই তাদের লক্ষ্য। শ্রোতা যা দেখতে চায়, তারা তা দেখায়। শ্রোতা যা শুনতে

চায়, তারা তা শোনায়। তাদের আচরণ রেস্তোরাঁর আজ্ঞাবহ ওয়েটারের মতো। গ্রাহক অর্ডার দেয় নি, এমন খাবার পরিবেশনের সাধ্য নেই।

৫৫.

সমাজ একপ্রকার কালেক্টিভ ডিসেনসিটাইজেশনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে পেঁয়াজের রস ছাড়া আর কিছুই আমাদেরকে কাঁদাতে পারবে না। অপছন্দের লোকজনের মৃত্যুতে নিয়মিত 'আলহামদুলিল্লাহ' পড়া হচ্ছে। দল, ধর্ম, ও আদর্শের বিভাজন মানুষকে অনুভূতিহীন করে তুলছে। রাষ্ট্রজীবীরা মনিবের আদেশ-নিষেধ পালন করছে ভৃত্যের মতো। মানবিক কোনো গুণ তাদের হৃদয় থেকে উৎসারিত হচ্ছে না। ইনফর্মেশন ও মিসইনফর্মেশন একই বোতলে একই দামে বিক্রি হচ্ছে। সত্য ও প্রোপাগান্ডার মাঝে কেউ পার্থক্য করতে পারছে না। নিজ বিশ্বাসের পক্ষে যায়, এমন সকল জিনিসকেই বিনা প্রশ্নে চোখ বুজে গ্রহণ করা হচ্ছে। সন্দেহ পোষণ করা হচ্ছে কেবল ওই জিনিসগুলির প্রতি, যা পছন্দের বিশ্বাস ও মতামতকে একটু-আধটু ধাক্কা দিচ্ছে। সত্য কেবল তা, যা আমাকে আরাম দেয়। আর সবকিছুই মিথ্যা। অধিকার বিষয়টি শুধু আমার গোত্রের মানুষদের জন্যই প্রযোজ্য। যারা আমার পছন্দের নয়, আমার ধর্ম ও দল যাদেরকে দেখতে পারে না, তাদের কোনো অধিকার নেই। যেহেতু আমার ভাবনার সাথে আপনার ভাবনা মিলছে না, সেহেতু আপনি একটি মন্দ লোক। ভালো লোক কেবল আমি ও আমার সেনারা। আমি যার পক্ষে, আপনাকেও তার পক্ষেই থাকতে হবে। অন্য পক্ষ নিলেই বুঝতে হবে– আপনি লোক সুবিধার না। আমি সঠিক পথে আছি, আমার দল ও পীর সঠিক পথে আছে, কেবল আপনি ভুল পথে আছেন, এ ব্যাপারে আমি একশো ভাগ নিশ্চিত। নিজ বিশ্বাসের পক্ষে যায়, এমন সবকিছুর ব্যাপারেই আমি একশো ভাগ নিশ্চিত। সেরা লেখক তিনি, যিনি আমার পক্ষে লেখেন। আমার বিপক্ষে লিখলেই তিনি আর সেরা লেখক নন। কারণ আমি যা বিশ্বাস করি, তার বাইরে কোনো সত্য নেই। আমি যাকে পছন্দ করি, তার কোনো দোষ নেই। সকল দোষ তার, যাকে আমি দেখতে পারি না। সকল অপরাধ তাদের, যাদের আমি ঘৃণা করি। অর্থাৎ একধরণের ট্র্যাজিক এক্সক্লুসিভিজম আমাদেরকে গ্রাস করে ফেলেছে। আমরা

এক্সক্লুসিভলি কেবল নিজ অবস্থান, নিজ ধর্ম, নিজ দল, ও নিজ আদর্শকেই সঠিক ভাবছি। আর কোনোকিছুকেই গুরুত্ব দিচ্ছি না।

৫৬.

হুজুর দিয়ে দোয়া করানো ঠিক নয়। দোয়া করতে হবে নিজে। হুজুরের হাতে টাকা দিয়ে দোয়া চাওয়ার অর্থ হলো– আল্লাহ দালালী পছন্দ করেন, বা হুজুর হলেন আল্লাহর মনোনীত দালাল। যারা আল্লাহকে পাসপোর্ট অফিস মনে করেন, তাদের উচিত নয় ধর্মকর্মে সময় নষ্ট করা।

৫৭.

পুঁজিবাদ যে শোষণকে উৎসাহিত করে, তার একটি ভালো উদাহরণ সাকিব আল হাসান। ভদ্রলোক ক্রিকেট খেলেন। হলফনামা অনুযায়ী তার বাৎসরিক আয় ৫ কোটি ৩২ লাখ টাকা। কিন্তু তার ঋণের পরিমাণ ৩৩ কোটি। বছরে পাঁচ কোটি টাকা আয়ের পরও কেন একজন লোকের ঋণ থাকবে, তা আমার বুঝে আসে না। সম্ভবত মানুষ ঘুমাতে চায় না।

৫৮,

ঈশ্বর মানুষের চিন্তার চেয়ে বড় নয়। মানুষ যা সৃষ্টি করেছে, তা দেবতারা সৃষ্টি করতে পারবে বলে মনে করি না। একটি স্মার্টফোন কম বিস্ময়কর নয়। আধুনিক ওষুধপাতির ক্ষমতা জাদুটোনার চেয়ে বেশি। ভিডিও কল তো মোজেজার সমান। সাহিত্যিক হিশেবেও মানুষ শ্রেষ্ঠ। মানুষের লেখা বই পড়ে মুগ্ধ হয়েছি অনেক, কিন্তু ঈশ্বরের লেখা বই পড়ে বিরক্ত হয়েছি।

৫৯.

তরুণদের কাছে স্পর্শকাতর বিষয় কী, তা বুঝতে কিছু জরিপ চালিয়েছিলাম। জরিপের ফলাফলে হতাশ হয়েছি। ধর্ম ও ব্যক্তিপূজা, এ দুটিই তরুণদের কাছে সবচেয়ে স্পর্শকাতর বিষয়। যে-বয়সে জ্ঞান-বিজ্ঞান, রাজনীতি, ও শিল্পকলা নিয়ে তুখোড় সময় কাটানোর কথা, সে-বয়সে তরুণরা ধর্ম নিয়ে মাতামাতি করছে। আসক্ত হচ্ছে ভক্তিবাদে। পড়ছে আজেবাজে বই, শুনছে জীবননাশী ওয়াজ। তারুণ্যের যে সহজাত স্পৃহা, যৌবনের যে অবাধ স্রোত, তার দেখা মোটেই পাচ্ছে না। ওদের ঘাড়ে মাথা আছে, কিন্তু মাথার ভেতর কোনো মাথা নেই। শুধু খা খা মরুভূমি। বুদ্ধি ও আক্কেল, দুটিই বন্ধক দিয়ে রেখেছে অদৃশ্য ব্যাংকে। সাংস্কৃতিক রক্ষণশীলতা নিয়ে এরা যতোটা সোচ্চার, প্রতিভার বিকাশ নিয়ে ততোটা সোচ্চার নয়। শিক্ষা এদেরকে দিন দিন অন্ধ করে তুলছে। কারণ শিক্ষা গ্রহণ ও বিতরণ, দুটিই করা হচ্ছে চোখে পট্টি বেঁধে। ফলে অনিবার্যভাবে, সমাজ ও সংস্কৃতি পানসে হয়ে উঠছে, রাষ্ট্র হয়ে উঠছে কর্তৃত্ববাদী। সোভিয়েত ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাই, বলশেভিক অথোরিটারিয়ানিজমের মূল চালিকাশক্তি ছিলো এ ধরণের ভক্তিবাদী তারুণ্য। এ তারুণ্যের মৃত্যু হওয়া দরকার।

৬০.

গণতন্ত্রে জনগণ হলো বীজ, রাজনীতিকরা গাছ। বীজ ভালো না হলে গাছও ভালো হয় না।

৬১.

অনেকেই জিগ্যেস করেন: আপনি যে জ্ঞানী, তার প্রমাণ কী?

আমি বলি– যদি জ্ঞানী না হতাম, তাহলে তো আপনাদের সাথে তর্ক করতাম। তর্কজীবীর সাথে যিনি তর্ক করেন না, তার জ্ঞান এমনিতেই সক্রেটিসের সমান।

৬২.

যারা পড়তে বা লিখতে জানে না, তারা অশিক্ষিত নয়। অশিক্ষিত তারা, যাদের মাথায় কোনো প্রশ্ন জাগে না।

লোকের জঙ্গল

১.

যদিও নিজের ঢোল আমাকে নিজে পেটাতে হয় না, মানুষই পেটায়, তবে যদি শোনি, কোথাও কেউ নিজের ঢোল নিজে পেটাচ্ছে, তাহলে খুব খুশি হই। কারণ যে-ঢোল আমার, তা আমি ছাড়া আর সকলেই পেটাতে পারবে, এমন পরকামী তত্ত্বে আমি বিশ্বাসী নই। তার ওপর যে-রাজ্যে মানুষ বিশ কোটি, ঢোলও বিশ কোটি, সে-রাজ্যে নিজের ঢোল নিজে না পিটিয়ে উপায় কী? পেশাদার ঢোলবাদক সকলেই মৃত্যুবরণ করেছেন, তবলাবাদকেরাও হারিয়ে গেছেন অরণ্যে, শুধু টিকে আছেন ঢোলের মালিকেরা। যাদের কথা ছিলো কেবলই শ্রোতা হয়ে বাঁচার, কাজ ছিলো শুধুই মুগ্ধ হওয়া, তারাও পেটের উপর বেঁধে রাখছেন মস্ত বড় ঢোল। আসল ঢোল নয়, ঢোলের নামে মহোদয়গণ যোগাড় করেছেন লাউয়ের খোল, বেলের ছারি, ও পলিথিনের বেলুন। আর প্রচার করছেন– দ্যাখো, আমাদেরও ঢোল আছে, কী দরকার অন্যের ঢোল বাজানোর?

এ অবস্থায় হরিশচন্দ্র মিত্রের "লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়"– এমন ছড়ায় বিশ্বাস রাখা বিপজ্জনক। কারণ অন্ধের পক্ষে সূর্য শনাক্ত করা সম্ভব নয়। লোকের চোখে জগদীশচন্দ্র বসুর চেয়ে দেওয়ানবাগের পীর অধিক গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথকে লোকের আদালতে ছেড়ে দিলে তাঁকে আর আস্ত রাখা হবে না। লোকে বুঝে শুধু আহার ও বিনোদন। এর বাইরে অন্যকিছু বুঝতে সে রাজি নয়। লোকের কাছে শুক্রগ্রহ একটি তারা। আবাবিল একপ্রকার পাখি। সংসদে কোনো এমপি দণ্ডবিধি সংস্কার নিয়ে কথা বললে লোকে তাকে 'বিরক্তিকর' বলবে। কিন্তু গান গাইলে ও শ্লোক আবৃত্তি

করলে, সেটিকে খুব উপভোগ করবে। ভবিষ্যৎমুখী গভীর ভাবনার চেয়ে জ্বালাময়ী ষাঁড়গোবরের কদর এখানে বেশি। এমন লোকমণ্ডলীর হাতে কী করে ছাড়ি নিজেকে বিচারের ভার? ছড়া যাদের কাছে কবিতা, কাহিনীকে যারা ডাকে উপন্যাস, ভাঁড়ামোকে যারা বলে নাটক, কিচ্ছার নাম যারা রেখেছে গল্প, হেঁয়ালি যাদের কাছে দর্শন, তাদের ছুরিকার নিচে জেনেশুনে কী করে পড়ি? আমার সবকিছুর মালিকানা আমার, কেবল ঢোলখানার মালিকানা লোকের, এমন মাঘী স্বপ্ন বর্ষাকালে কী করে দেখি?

২.

শুনেছি ঢোলের একমুখে থাকে গরু ও মহিষের মোটা চামড়া, আর অন্যমুখে থাকে ছাগলের পাতলা চামড়া। কিন্তু অন্যের ঢোলের বাড়ি শুনলে যাদের পিত্তি জ্বলে যায়, তাদের ধারণা, ঢোলের উভয় মুখেই বুঝি থাকে বাছাই করা ছাগচর্ম। এ জন্য ভয়ে, তারা অন্যের ঢোলও শুনে না, নিজের ঢোলও বাজায় না। তবে আমি বিনয় বাঁশী জলদাস। ঢোল যদি ঢোলের মতো হয়, তাহলে তা দারুণ ছন্দে বাজাতে জানি। বাংলাদেশে এই মুহূর্তে যে-লোকমণ্ডলী আছে, তাদের পক্ষে কি উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর ঢোলে বাড়ি দেয়া সম্ভব? সম্ভব নয়। কারণ উপেন্দ্রনাথকে তারা চেনেই না। মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা বা কালীপ্রসন্নের মালতীমাধবের নাম তারা না জানলেও, টেলিভিশনের কয়েকশো কুনাটক তাদের মুখস্থ। রামনারায়ণ তর্করত্ন তাদের কাছে অচেনা, কিন্তু মনোরঞ্জন আহমেদ খুব চেনা। পদ্যকাররা এখানে ভাব ধরে আছে বিষ্ণু দে'র। দার্শনিক ও বিজ্ঞানী নেই বললেই চলে। এমন বাহারি লোকজঙ্গলে কী করে আশা রাখি, প্রতিভার ঢোল সবসময় বাজাবে লোকে?

৩.

এ এমন এক বন, যেখানে কিছু তথ্য মুখস্থ আউড়ে গেলেই তকমা দেয়া হয় জ্ঞানীর, চার-পাঁচটি চটোকথা রসিয়ে বললেই আখ্যা দেয়া হয়

দার্শনিক; এ এঁদো ডোবায়, এমন পচা রগারণ্যে কী করে বিশ্বাস রাখি জনমতে? যেখানে–

“আমরা হেঁটেছি যারা নির্জন খড়ের মাঠে পউষ সন্ধ্যায়
দেখেছি মাঠের পারে নরম নদীর নারী ছড়াতেছে ফুল”

এরূপ নিটোল কাব্যমালা ঘুমোয় গোপনে বইয়ের পাতায়, আর মঞ্চ সরব থাকে উত্তেজক পদ্য ও ছড়ায়, সেখানে কোন মুখে চাই শিল্পকলার সনদ জনতার কাছে? বুদ্ধদেব কি চাইবেন, তাঁর প্রতিভার ঢোলটি আজিজপল্লীর মাতালেরা বাজাক? আর বাজালেও কি তাতে উঠবে কোনো সুর? দুঃখ আমাদের মুখরা ননদিনী, মৃত্যু আমাদের পূজ্য ব্রাহ্মণ– এমন কবিতার কবি যদি নিজের ঢোল নিজে বাজান, তাতে অপরাধটা কোথায়? কান্ট কি আশা করবেন, লালনভক্তরা এসে বাজিয়ে দেবে তাঁর ঢোল? কৃমির পক্ষে কি সম্ভব কৃমিনাশকের প্রশংসা করা?

৪.

যে-সমাজে বাস করি, সেখানে মহৎ মানুষেরা সর্বদাই খেলোদের দ্বারা আক্রান্ত। কচুগাছ সুপারি গাছকে বলছে, আমি তোমার চেয়ে লম্বা। গুল্মকাণ্ড তালগাছকে বলছে, আমি তোমার চেয়ে মোটা। যে-এলাকায় বন্ধ্যা মানুষেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সে-এলাকায় সৃষ্টিশীল মানুষজন যদি কেবলই ঢোল নির্মাণ করে যায়, আর তা একবারও না বাজায়, তাহলে তাদের সমস্ত সৃষ্টিই পর্যবসিত হতে পারে অনাসৃষ্টিতে। কারণ লোচন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতো ‘অন্যের ঢোল আমি পেটাবো’ প্রকৃতির লোক এখন আর নেই। একটি চৈতন্যমঙ্গল বা চৈতন্যচরিতামৃত লিখতে হলে এখন তা চৈতন্যদেবকে নিজেই লিখতে হবে। কোনো বৃন্দাবন দাস বা নিত্যানন্দ প্রভু চৈতন্যদেবের ঢোল বাজিয়ে রচনা করবে চৈতন্যভাগবত, এমনটি বঙ্গলোকে আশা করা ঠিক নয়। এপিস্টেমোলোজি নিয়ে কথা বললে এ বনে শ্রোতা হিশেবে হাজির হয় ছড়াকাব্যের অনুরাগী। মেটাফিজিক্স নিয়ে ভাষণ দিলে ভুল ধরতে আসে হামদ-নাতের কারিগর। এ অবস্থায় লোকে আবিষ্কার করবে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রতিভা, আর বাজাবে প্রতিভার

ঢোল, এমন কল্পনা জোঁকের কামড়ে রক্ত না হারানোর কল্পনা। প্রতিভা চিনতেও প্রতিভার দরকার। প্রতিভাহীন মানুষের পক্ষে প্রতিভাবাবান মানুষ শনাক্ত করা সম্ভব নয়। চরমোনাই পীরের হাতে যদি নিউটনকে চেনার ভার দিই, তাহলে বিপদ। খ্রিস্টান রাজ্যে ডারউইনের ঢোল পাদ্রীরা বাজাবে, এমন ভাবনা প্রতিভাঘাতী।

এ জন্য প্রতিভাবানদের উচিত, শুধু ঢোল নির্মাণে সময় ব্যয় না করে ঢোল বাজানোতেও সময় ব্যয় করা। প্রয়োজনে ঢোলটিকে ঢাকে উন্নীত করা। কেউ এসে বাজিয়ে দিয়ে যাবে ঢোল, বিনা মাইনেতে, এই ভদ্রস্বপ্ন চোখে পোষা আর সমীচীন নয়। কাল যদি কোনো গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী 'অশ্রুকণা' রচনা করেন, তাহলে ঘেটুবাদী প্রচারমাধ্যমগুলো তা প্রচার করবে বলে মনে হয় না। কারণ ঘেটুপত্রিকাগুলো এফডিসির রঙ্গলীলা ছাপতে যতোটা আগ্রহী, ততোটা আগ্রহ প্রতিভাসন্ধানের বেলায় দেখা যায় না। প্রতিভা ছাঁচ-বিরোধী। ছাঁচে মাপা লোক প্রতিভাধর নয়। কিন্তু ঘেটুভিশন ও ঘেটুপত্রিকাগুলো যেন ছাঁচ নির্মাণের কারখানা। ভিন্নমতী মোষের চেয়ে সহমতী ছাগল তাদের অধিক পছন্দ। কতো ইঁদুরকে যে তারা ম্যামথ রূপে প্রচার করেছে, কতো বেলুনকে যে রাত-দুপুরে ঢাক বানিয়ে পিটিয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। বেলুনের ভুরুম ভুরুম শব্দে ঢাকা পড়ে গেছে ঢাকের দ্রিম দ্রিম ডাক।

৫.

কালের প্রবাহে যে-কয়জন গুণী ব্যক্তি এ অঞ্চলে টিকে গেছেন, তারা কমবেশি নিজের ঢোল নিজে পিটিয়েছেন বলেই রক্ষা পেয়েছেন। যদি ছেড়ে দিতেন ঢোলখানি, ষোলো আনা অন্যের হাতে, তাহলে এতে উঠতো কেবলই বিকৃত সুর। সত্যেন বোসের ঢোলটি সুদূর জার্মানিতে বসে আইনস্টাইনকে বাজাতে হয়েছিলো। কারণ কী? কারণ সত্যেন বোসের যে-প্রতিভা, তা আবিষ্কার করার মতো প্রতিভা বঙ্গারণ্যে ছিলো না। প্রতিভা আবিষ্কারের জন্যও প্রতিভাবান লোক চাই। আজ ইন্টেজার-স্পিনের সাব-অ্যাটোমিক কণাগুলিকে যে আমরা বোসন নামে ডাকি, তার কারণ, সত্যেন বোসের ঢোলটি পল ডিরাক নামের এক প্রতিভাবান ঢুলির হাতে পড়েছিলো

বলে। যদি সত্যেন বোস আইনস্টাইনের কানে নিজের ঢোলটি নিজে না পেটাতেন, তাহলে কি এ বঙ্গপ্রতিভার আওয়াজ বিশ্ববাসী শুনতে পেতো? পেতো না। শাহবাগ ময়লাপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে কি বোস-আইনস্টাইন স্ট্যাটিস্টিক্সের ঢোল পেটানো সম্ভব ছিলো? ছিলো না। প্রতিভাবান কোনো গবেষকই এখন বিশ্ববিদ্যালয়টিতে নেই। সারাদেশ থেকে নাকি গোপাল ভাঁড়েরা ওখানে গিয়ে অধ্যাপক, ভেক্টর, তমস্যার্য, প্রভৃতি রূপে জড়ো হচ্ছেন।

৬.

বঙ্গ এমন এক এলাকা, যেখানে তার নিজ ঘরের বাদ্যযন্ত্রে অন্য এলাকার লোকদেরকে এসে সুর তুলতে হয়। উপযুক্ত শ্রোতার অভাবে এখানে সবসময়ই অনুচ্চারিত থাকে প্রতিভার মাইক। নোবেল পুরস্কারটি না থাকলে রবীন্দ্রপ্রতিভাকে অনেকেই অস্বীকার করতো। লোকে বিহারীলালকে ভুলে গেলেও মনে রেখেছে লোকরঞ্জনবাদী পদ্যকারদের। গোবিন্দচন্দ্র দেবের নাম কোথাও আর শুনতে পাই না। বেগম রোকেয়া নামটি বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছে। ম্লান হতে চলেছে ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়দের স্বাক্ষর।

তবে নাম উচ্চারণ করাকে কেউ কেউ বানিয়ে ফেলেছেন পেশা, এবং নির্দিষ্ট কিছু নামের বাহিরে আর কোনো নাম তারা নিতে চান না। এতে মতলব ও ব্যবসা, দুটিই হাসিল হয়। খাদেমদের কাজই হলো কাউকে পীর বানিয়ে দুটি পয়সা রুজগার করা। খাদেমকুলের কাছে শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিজ্ঞানী তার পীর, শ্রেষ্ঠ দার্শনিক তার পীর, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক তার পীর, অর্থাৎ পৃথিবীর যা কিছু শ্রেষ্ঠ, তার সবকিছুই তার পীর। সলিমুল্লাহ খান ক্লান্তিহীনভাবে বাজিয়ে চলছেন আহমদ ছফার ঢোল; আহমদ ছফা নিরলসভাবে বাজিয়েছেন, একটি বইয়ে, আব্দুর রাজ্জাকের ঢোল। কিন্তু এমন ঢুলি আবার হুমায়ুন আজাদের কপালে জুটে নি। কারণ এ অঞ্চলে বুদ্ধিঢুলিরা কেউ প্লেটো নন যে তারা নির্মোহভাবে বাজাবেন সক্রেটিসদের বাঁশি। বঙ্গপ্লেটোগণ সক্রেটিস বাছাই করেন ধর্ম, অধর্ম, রাজনীতি, ও শ্রেণীহিংসার ভিত্তিতে। হুমায়ুন আজাদ ধর্মহীন ছিলেন, কথা বলতেন চাঁছাছোলো, তাই তাঁর পক্ষে ধর্মভীরু জনপ্রিয়রা প্রকাশ্যে ঢোল বাজাতে

রাজি হন নি। কেবল গোপনে কেউ কেউ স্বীকার করেছেন। এমন অনেকেই আছেন, যারা নষ্ট বুদ্ধিঢুলিদের চক্রান্তে তিল থেকে পরিণত হয়েছেন তালে, এবং মহীরুহ থেকে পর্যবসিত হয়েছেন কেউড়া লতায়। শ্রোতামণ্ডলীর অবস্থা এমন যে, আপনি যদি আল মাহমুদের কবিতার শিল্পমান বিশ্লেষণ করেন, তাহলে সেটি কেউ পড়বে না; কিন্তু যদি ঘোষণা দেন– 'আমি আল মাহমুদের চেয়ে বড় কবি', তাহলে এক লাখ লোক ঝাঁপিয়ে পড়বে। কারণ নদীর চেয়ে প্রবাহিত মলভাণ্ড এ অঞ্চলে অধিক জনপ্রিয়। যে-মাছ পায়খানা খায়, তাকে কেউ সহজে অন্যকিছু খাওয়াতে পারে না। উটকল মাছের কাছে মধুর স্বাদ জানতে চাওয়া হঠকারিতা।

৭.

লোক মাত্রই মিডিওকার। তবে সবচেয়ে বেশি মিডিওকার বিশ্ববিদ্যালয়ের চোস্ত মানুষরা। কারণ শিক্ষা মানুষকে নিরক্ষরতা থেকে মুক্তি দিলেও মূর্খতা থেকে দেয় না। প্রতিভার বিকাশে সাধারণ মূর্খতা কোনো বাধা নয়, বাধা হলো প্রশিক্ষিত মূর্খতা। প্রশিক্ষিত মূর্খের পক্ষে প্রতিভার স্বীকৃতি দেয়া সম্ভব নয়। কারণ মূর্খটি নিজেকেও প্রতিভাবান মনে করে, এবং লিপ্ত হয় প্রতিভাবানদের সাথে গোপন প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। যদি আমিও তার মতো হতে পারতাম, এমন আক্ষেপে সে চালাতে থাকে মানসিক মল্লযুদ্ধ। এই মিডিওকারগণ সব যুগে সব স্থানেই ছিলো। এমনকি শেক্সপিয়রের সময়েও। মৃত্যুর কিছুকাল পরই শেক্সপিয়ারের রত্নভাণ্ডার ঢেকে গিয়েছিলো বেন জনসন, মাসিঙ্গার, বোমন্ট, ও ফ্লেচারের মিডিওকার গড়ভাণ্ডার দ্বারা। অসৎ ঢুলিরা দশকের পর দশক ধরে শেক্সপিয়রকে তাঁর প্রাপ্য সুপ্রিম্যাসি থেকে বঞ্চিত করেছিলো। কান্টের অত্যন্ত সিরিয়াস ফিলোসোফি অন্ধাকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলো ফিকটা, শিলিং, ও জ্যাকোবির আজগুবি ফিলোসোফি দ্বারা। শেক্সপিয়ারকে তাঁর নিজ সময় এতোটাই অবহেলা করেছিলো যে, তাঁর একটি ছবি পর্যন্ত আমাদের হাতে নেই। মিডিওকারদের কাজই হলো প্রতিভাবানের প্রতিভার চিহ্ন নিশ্চিহ্ন করা। লোক তো অনেক ছিলো, শেক্সপিয়ারের কালে, কিন্তু লোকের পক্ষে কি অনুধাবন করা সম্ভব ছিলো, কী সূর্য ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের ভীড়ে? লোকের পক্ষে যদি এক্সিলেন্স শনাক্ত করা সম্ভব হতো, তাহলে শেক্সপিয়ারের হাতের

লেখা তারা সংরক্ষণ করতো। গুটিকয়েক কোর্টরুম ডকুমেন্টে তাঁর সিগন্যাচার আমাদেরকে খুঁজে বেড়াতে হতো না। তাঁর কবরের উপরে যে মস্তকমূর্তিটি আছে, সেটির অবস্থা আরও শোচনীয়। এই শেক্সপিয়ার, যিনি সারা বিশ্বের জন্যই সাহিত্যের এক উজ্জ্বল বাতি, তাঁকে তাঁর সনেটগুলোয় নিজের ঢোল নিজে পেটাতে হয়েছিলো। অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সাথে ঘোষণা দিতে হয়েছিলো, আমি যা লিখেছি, তা অমর। পর্তুগিজদের একমাত্র কবি, ক্যামাজ, তাঁকে জীবদ্দশায় ভিক্ষার টাকায় চলতে হয়েছিলো। পর্তুগালের বিপুল লোকমণ্ডলী তাঁর কোনো কাজে আসে নি। গ্যালিলিওর অবস্থা তো সকলেই জানি। লোকের ঝাঁক কি তাঁকে সুখ দিয়েছিলো? ভারতবর্ষে চন্দ্রশেখর আজও অপরিচিত। আল-মুতানাব্বির নাম কারও মুখে শুনি না। এই হলো 'লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়'-র অবস্থা। লোক একপ্রকার পশু। লোকের পক্ষে 'বড়' শনাক্ত করা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি হিংসাক্রান্ত মিডিওকারের পক্ষে তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাদের স্বীকৃতি দেয়াও অসম্ভব। খুব বড় ও উঁচু বৃক্ষের চারা লোকে চিনতে পারে না।

শুধু সাহিত্য বা শিল্পকলা নয়, এটি বিজ্ঞানের বেলায়ও সত্য। লোক যদি কোনো পচা খাবার একবার খেয়ে ফেলে, তাহলে তাদের পেট থেকে সেটি সহজে বের করা যায় না। কোপার্নিকাসের চমৎকার ও বৈপ্লবিক তত্ত্বের বহু দশক পরও লোকসমাজে টলেমিক সিস্টেম খুঁটি গেড়ে বসেছিলো। প্রিন্সিপিয়া প্রকাশের পর নিউটন প্রায় চল্লিশ বছর বেঁচেছিলেন, কিন্তু এ চল্লিশ বছরে তাঁর তত্ত্ব নিজ দেশেই গৃহীত হয়েছিলো সামান্য। বৈজ্ঞানিক লোকসমাজ সাহিত্যিক লোকসমাজের মতোই ঈর্ষাপরায়ণ। ভলতেয়ারের কথা আমলে নিলে, ইংল্যান্ডের বাইরে নিউটনের কুড়িজনের বেশি অনুরাগী ছিলো না। মৃত্যুর প্রায় বিশ বছর পর নিউটনের তত্ত্ব ফ্রান্সে পরিচিতি পায়, এবং সেটি ভলতেয়ারের কারণে। ভলতেয়ার যদি নিউটনের প্রশংসা করে ওই ট্রিটিজটি না লিখতেন, তাহলে ইংলিশ চ্যানেলের ঐ পারে নিউটন পৌঁছুতে পারতেন না। হয়তো আরও কয়েক দশক ফরাসিদেরকে কার্টেসিয়ান ভর্টেক্সে আস্থা রাখতে হতো। অথচ ফরাসিরা, এর কিছুকাল আগেও ইশকুল কার্টেসিয়ান দর্শন নিষিদ্ধ করে রেখেছিলো। লোকের আক্কেল বুঝতে আমি ফ্রান্সের তৎকালীন চ্যান্সেলর ফ্রাঁসোয়া দাগাসুর দিকে তাকাতে পারি। তিনি করলেন কী, নিউটনের ওপর লেখা ভলতেয়ারের

রচনাটি ছাপানোর অনুমতি পর্যন্ত দিলেন না! এই হলো মিডিওকারদের মানসিকতা। নক্ষত্রকে যেমন ইন্টারস্টেলার ডাস্ট ঠেলে নিজেকে উজ্জ্বল করতে হয়, তেমনি বড় লেখক, বড় দার্শনিক, বড় বিজ্ঞানী, তাদেরকেও একই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে নিজের নামটি সমাজে ছড়াতে হয়। বেকন ও দেকার্তের কাজ অনেক বছর ধুঁকে লোকের বাধা পেরিয়েছিলো। জন লককে তো তাঁর বৈপ্লবিক ট্রিটিজটি পরিচয় লুকিয়ে প্রকাশ করতে হয়েছিলো।

৮.

'সঠিক বা গ্রহণযোগ্য মতামত'-এর চেয়ে 'প্রতিষ্ঠিত মতামত'-এ লোকের অধিক আস্থা। যেহেতু সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করেন মিডিওকার লোকজন, তাই পত্রিকা ও টেলিভিশনের দখল সবসময়ই থাকে মিডিওকারদের হাতে। সাংবাদিক ও কলামিস্টগণ ঐতিহাসিকভাবেই মিডিওকার। ধর্মের মালিকানাও মিডিওকারদের হাতে। ফলে অনিবার্যভাবে, সমাজে সবসময় মিডিওকার সাহিত্য, মিডিওকার শিল্পকলা, মিডিওকার বিজ্ঞান, মিডিওকার দর্শন, মিডিওকার রাজনীতি, মিডিওকার ধর্ম, এসব দুর্বল জিনিস প্রভাবশালী রূপে বিরাজ করে। যা থাকার কথা ছিলো নিষ্ক্রিয়, তা হয়ে ওঠে সবচেয়ে ক্রিয়াশীল। সর্বত্র চোখ রাঙাতে থাকে মিডিওকার জিনিসের প্রচারণা। সংবাদপতিরা পালবেঁধে দৌড়োনো শুরু করে মিডিওকারদের পেছনে। বইমেলায় মিডিওকার লেখকদের সামনেই থাকে ক্যামেরা ও অটোগ্রাফের সর্বোচ্চ ভিড়। চাইলেই, মিডিওকার লোকজন দলবেঁধে সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন পছন্দের জনমত। এবং এটি তারা চায়। যেহেতু মিডিওকাররা প্রাকৃতিকভাবে সুপেরিয়র গুণাবলীর অধিকারী নয়, তাই এরা কৃত্রিমভাবে নিজেদেরকে সুপেরিয়র দেখাতে মরিয়া থাকে। অথবা তাদের চেয়ে বড়, তাদের চেয়ে মহৎ, তাদের চেয়ে সুন্দর কেউ যেন সমাজে প্রচার না পায়, এটি নিশ্চিতে গোপনে কাজ করে চলে। তারা বালথাজারের গল্পের ওই পাখিদের মতো, যারা ময়ূরের সৌন্দর্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে মিটিংয়ে বসেছিলো– কীভাবে ময়ূরকে পর্যুদস্ত করা যায়, এ নিয়ে। দোয়েল পাখি প্রস্তাব করেছিলো, যদি কোনোভাবে ওর পেখম মেলানোটা

বন্ধ করতে পারি, তাহলেই চলবে। পেখমটা দেখলে আমার কলিজা জ্বলে যায়।

মিডিওকাররা বিনয় এতো পছন্দ করে কেন, তার একটি ইঙ্গিত এ গল্পে আছে। মিডিওকারদের চাওয়া হলো, প্রতিভাবানরা ভদ্রতা করে যেন তাদের প্রতিভা লুকিয়ে রাখে। আমি প্রতিভাবান, আমি সৃষ্টি করতে জানি, সমাজ ও সভ্যতার উন্নয়নে করে চলেছি গুরুত্বপূর্ণ কাজ, এমন কথা যেন নিজ মুখে তারা উচ্চারণ না করে, এটি নিশ্চিত করতেই রটানো হয়– নিজের ঢোল নিজে পেটানো ঠিক নয়। কেউ পেটালে বলা হয়, লোকটি অহংকারী; সে নিজেকে বড় ভাবে। কেউ নিজেকে বড় ভাবছে, এটি বাঙালির সহ্য হয় না। সে সহ্য করে কেবল অন্যের ছোট হয়ে যাওয়া। বা বলা হয়, কেবল মূর্খরাই নিজেকে জ্ঞানী মনে করে। অর্থাৎ প্রতিভার ঢোলটি যেন প্রতিভাবানরা কখনো নিজে না বাজায়, এবং অন্যরাও বাজানোর সুযোগ না পায়, তা নিশ্চিত করাই মিডিওকারদের প্রধান চাওয়া। ঠিক যেমন ওই দোয়েল পাখিটি চায়, ময়ূর তার পেখমখানা লুকিয়ে রাখুক। মিডিওকারদের ঈর্ষা থেকে রক্ষা পাওয়ার কৌশল হিশেবেই বিনয়ের উদ্ভব ঘটেছিলো। লিখটেনবার্গ বলেছিলেন, বিনয় কেবল তাদের কাছেই মহৎ গুণ, যাদের আর কোনো গুণ নেই। গ্যেটে বলেছিলেন আরও ভয়ংকর কথা- নু ডি লুম্পিন জেন পিশাইড়ু। কেবল তুচ্ছ মানুষেরাই বিনয়ী।

৯.

মিডিওকারগণ অনুকরণপ্রিয়। তারা সৃষ্টিশীল নয়। হীনম্মন্যতা থেকেই সৃষ্টিশীল প্রতিভাদের তারা শত্রু মনে করে। হীনম্মন্যরা যখন প্রতিভাধরদের কাজের প্রশংসা করে, তখন তা দুটি কারণে করে। এক– কাজটিকে তারা নকল বা ইমিটেইট করতে পারবে বলে ভাবে, অর্থাৎ কাজটি যখন গড়মানের হয়; দুই– কাজটির সুখ্যাতি সমাজে এতো প্রতিষ্ঠিত যে, এটির প্রশংসা না করে উপায় নেই বলে। প্রথম কারণটি সিসেরোর "ট্যানতুম কুইস্কো লাউদাত, কুয়ানতুম সে পোসে স্পেরাত ইমিতারি" উক্তিতে লুকিয়ে আছে। সিসেরোর ভাষায়, লোকে সেসব কাজেরই প্রশংসা করে, যেসব কাজকে তারা অনুকরণ করতে পারবে বলে মনে করে। অর্থাৎ যা কিছু সাধারণ, ট্রিভিয়াল, তুচ্ছ, ও গড়মানের, তা মিডিওকারগণ সহজেই

গ্রহণ করে। অসাধারণ কিছু দেখলেই এরা ভয় পায়। আঁতকে ওঠে। চুপ থাকে কবরের মতো। অথবা বিষোদগার করে প্রাণপণে। এ জন্য ফোসিওনের বক্তৃতার সময় লোকজন যখন হঠাৎ হাততালি দিচ্ছিলো, তখন ফোসিওন তাঁর বন্ধুকে জিগ্যেস করেছিলেন, আমি কি খুব তুচ্ছ কিছু বলেছি? না হলে লোকে এতো হাততালি দেবে কেন?

১০.

মিডিওকার কারা? 'লোকে যারে বড় বলে'– এখানে লোক কে? একজন কৃষক কি মিডিওকার? একজন গার্মেন্টস শ্রমিক কি 'লোক'? না, তারা তা নয়। এরা সাধারণ দর্শক ও শ্রোতা, যারা প্রতিভাকে ঈর্ষাও করে না, লেজ টেনে খাদেও নামায় না। নির্দিষ্ট কোনো বিশ্বাসের দালাল হয়ে প্রতিভার বিরুদ্ধে লড়াইও করে না। মিডিওকার তারা, যারা নিজেকে সাধারণ ভাবতে প্রস্তুত নয়, আবার অসাধারণ হিশেবে গড়ে তুলতেও সমর্থ নয়। এরা 'এপিল টু অথোরিটি' বাহিনীর সদস্য। জঙ্গলে ভিন্ন জাতের ফুল দেখলে ভয় পায়। বুদ্ধির চেয়ে বিদ্যায় এদের অধিক আস্থা। এরা যখন কিছু বলে, তখন তাতে বিদ্যার ছাপ অল্পবিস্তর থাকলেও বুদ্ধির ছাপ একেবারেই থাকে না। কারণ এরা বিদ্যা হজম করতে জানে না। বুদ্ধিহীন বিদ্যার সাথে মূর্খতার যে বিশেষ পার্থক্য নেই, এ খবর তারা রাখে না। 'অথোরিটি', অর্থাৎ 'কোনো বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত মতামত'-কে পূজা করতে এরা খুব পছন্দ করে। ছাঁচের বাহিরে কিছু দেখলেই আঁতকে ওঠে। সর্বদা বাস করে প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের ভেতর। নিজের চেয়ে উঁচু, নিজের চেয়ে মহৎ কাউকে দেখলে হীনম্মন্যতায় ভোগে, বিশেষ করে যদি মহৎ লোকটি নিজ সময় ও এলাকার হয়।

জীবিত প্রতিভাকে কবর দেয়ার জন্য এরা ঢাল হিশেবে ব্যবহার করে মৃত প্রতিভাকে। এরা যখন পছন্দের কারও প্রশংসা করে, তখন মূলত অপছন্দের কাউকে ঘায়েল করার উদ্দেশ্যে করে। দুর্বল পশুর মতো এরা পালবেঁধে চলে। যেহেতু এরা সংখ্যায় অধিক, এবং স্বভাবে নির্লজ্জ, আর খুব স্বার্থসচেতন, তাই এদের পক্ষে দর্শক, শ্রোতা, ও পাঠকের সাথে তাল মিলিয়ে চলা সহজ হয়। মিডিওকার সমাজে প্রতিষ্ঠানগুলোর দখলও থাকে

মিডিওকারদের হাতে। ফলে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি, যেমন পুরস্কার বা পদক, এগুলো চক্রাকারে মিডিওকারদের গলায়ই ঝুলতে থাকে। শিল্প-সাহিত্যের অনুষ্ঠানগুলিতেও থাকে মিডিওকারদের ছড়াছড়ি। এসব দেখে সমাজ ভাবে, মিডিওকাররাই শ্রেষ্ঠ প্রতিভা। মিডিওকারদের সৃষ্টিই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার যে শক্তি, সেটিকে সমাজ উপেক্ষা করতে পারে না। কিন্তু মানুষকে সংখ্যাগরিষ্ঠতার শক্তি তথা লোকের জঙ্গল সম্পর্কে সাবধান হতে হবে।

দর্শন কী?

১.

দর্শন কী? এ প্রশ্ন বাংলাভাষী কাউকে করা বিপজ্জনক। যারা টকশো ও মাস্টারি করেন, তারা প্রশ্নটির উত্তরে যা বলেন, তা মুখস্থ এনসাইক্লোপিডিক বক্তৃতা। শুনলে মনে হবে, একটি ভাঙা রেলগাড়ি, পথ ও বগি হারিয়ে রওয়ানা দিয়েছে অন্ধকার কোনো অরণ্যের দিকে। দর্শন, বিজ্ঞান, ও ধর্ম– তিনটি ট্রেনই এ অঞ্চলে সবসময় ভুল যাত্রী নিয়ে ভুল স্টেশনের দিকে এগোতে থাকে। এতে জ্বালানি পোড়ে ঠিকই, কিন্তু কোনো লক্ষ্য সাধিত হয় না। কেউই গন্তব্যে পৌঁছে জানাতে পারেন না, আমি আলোর দেখা পেয়েছি। এর প্রধান কারণ– তিনটি বিষয়ই এখানে বেঁটে লোকজন দ্বারা শাসিত। অর্থ, ক্যামেরা, ও খ্যাতি– এ তিনের পাকে পড়ে কাণ্ডারিরা সহজেই মৃত্যুবরণ করেন। ফলে অনিবার্যভাবে, এ অঞ্চলে দর্শন হয়ে উঠেছে লালন ফকির ও চাকুরিজীবীদের কর্মকাণ্ড। বাংলাদেশ ও ভারতের দর্শনকে গ্রিক বা কন্টিনেন্টাল দর্শনের চশমা দিয়ে দেখতে হবে, এমন দাবি আমি করছি না, কিন্তু বাউল গান ও উদাস ছড়াকবিতার সাথে যে দর্শনের একটি মৌলিক পার্থক্য আছে, সেটি অনুধাবন করা দরকার। অন্যথায় সব তরলকেই পানীয় মনে হবে, এবং পান করার পর আফসোস করতে হবে– আহা, কেউ সতর্ক করলে হয়তো গড়লটি থেকে বাঁচা যেতো।

২.

দর্শনের জন্ম কৌতূহল থেকে। যে-প্রাণী বুদ্ধিমান ও কৌতূহলী, যে-জীব দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছু নিয়ে নিঃসঙ্কোচে প্রশ্ন তুলতে পারে, এবং জ্ঞানযোগে সুসংহতভাবে সেসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে জানে, তার কর্মকাণ্ডই দর্শন। আমি প্রজ্ঞাবান, প্রজ্ঞার প্রেমে আমি হাবুডুবু খাচ্ছি, লাভ অভ উইজডম, দর্শনের এ ধরনের সংজ্ঞা বিভ্রান্তিকর। কারণ সভ্যতা পিথাগোরাসের যুগে থেমে নেই। বাংলাদেশ বিশ কোটি প্রজ্ঞাবানের দেশ। তাদের অনেকেই মুখ খুললে বাতাস ভারী হয়ে ওঠে প্রজ্ঞায়, বোধির ঝলকে উপচে পড়ে টেলিভিশন, জার্গনের আঘাতে কাঁপতে থাকে ফেসবুক ও পত্রিকা, তাই বলে কি বলতে পারি– বাংলাদেশ বিশ কোটি দার্শনিকের দেশ? বলতে পারি না। চৌকিদারকে যেমন পুলিশ সুপার বলা যায় না, তেমনি কেউ সারাক্ষণ মৃত পূর্বসূরীদের নাম নিলেই তিনি দার্শনিক হয়ে উঠেন না।

৩.

দর্শন পথ সৃষ্টি করে, তবে সে-পথ পথচারীকে ঠিক কোথায় নিয়ে যাবে– তা নিশ্চিত জানায় না। দর্শন পথ দেখায়, কিন্তু ওই পথের শেষে 'সত্য' বা 'সমাধান' আছে কি না, থাকলে তার রূপ কী, সে-সম্পর্কেও কিছু বলে না। শুধু বলে, ওই দিকে যাও, 'সত্য' বা 'সমাধান' পেতে পারো। যদি পাওয়া যায়, তাহলে তা কিছু ক্ষেত্রে হয়ে উঠে বিজ্ঞান, কিছু ক্ষেত্রে প্রথা। যদি না পাওয়া যায়, তাহলে ওই পথের প্রান্ত থেকে সৃষ্টি হয় আরও নতুন পথ। সরল করে বললে, দর্শন আমাদেরকে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রচলিত 'সত্য' ও 'সমাধান' প্রত্যাখ্যান করে নতুন সত্য ও সমাধান নির্মাণ করতে বলে। এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও ধর্মের সাথে দর্শনের পার্থক্য হলো: ১) বিজ্ঞান সর্বদা প্রচলিত সত্যে স্থির থাকতে চায়, অথবা চাহিদা অনুযায়ী প্রচলিত সত্য ও সমাধানের উন্নয়ন ঘটিয়ে 'অধিকতর গ্রহণযোগ্য সত্য ও সমাধান' উদ্ভাবন করতে বলে; আর ২) ধর্ম তার সুবিধা ও মতলব অনুযায়ী সত্যের রূপ নির্দিষ্ট করে দেয়, যার বাইরে ধর্ম অনুসারীদের চিন্তা করার কোনো সুযোগ থাকে না। যে-সত্য ধর্মপ্রচারকের স্বার্থ রক্ষা করে না, সে-সত্য ধর্মের চোখে 'সত্য' নয়।

৪.

দর্শন বিজ্ঞানকে পথ দেখাতে পারলেও ধর্মকে পারে না। কারণ ধর্মের ধর্ম হলো সারাক্ষণ একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে স্থির থাকা। আসন ছাড়লেই এর বিলুপ্তি ঘটে। ধর্ম যদি বলে, সাত আসমানের উপর একটি নীল তিমি আছে, তাহলে ধার্মিকদের পক্ষে ওই নীল তিমিকে অস্বীকার করা সম্ভব হয় না। কিন্তু দর্শনে এ স্থিরতা নেই। দর্শন গতিশীল ও প্রবহমান। দর্শন যখন স্থির হয়ে পড়ে, তখন তা আকার ধারণ করে ধর্ম ও রাজনীতিক আদর্শের। গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীরের দর্শন এখন ধর্ম হয়ে গেছে, যেরকম মার্ক্সের দর্শন পরিণত হয়েছে রাজনীতিক লিফলেটে। ফলে বলা যায়, অন্ধ অনুসারী বা মুরিদ নয়, দার্শনিকের প্রধান কাজ সমাজে নতুন দার্শনিক সৃষ্টি করা, যারা তার মতামতকে এগিয়ে নেবেন সামনের দিকে, অথবা বিকল্প মতামত দ্বারা চ্যালেঞ্জ করবেন বিদ্যমান মতামতকে। থ্যালিস যখন বললেন, সবকিছুর উদ্ভব পানি থেকে হয়েছে, তখন তাঁর ছাত্র এনাক্সিম্যান্ডার জানালেন– পানি নয়, সবকিছুর উদ্ভব ঘটেছে আপিরোন থেকে। কিন্তু এনাক্সিম্যান্ডারের ছাত্র আনেক্সিমিনিস প্রচার করলেন নতুন কথা। তিনি বললেন, আপিরোন নয়, সবকিছুর জন্ম বাতাস থেকে। তবে বাতাসও বেশিদিন টেকে নি। হেরাক্লিটাস এসে শোনালেন, মহাবিশ্ব তৈরি হয়েছে আগুন থেকে। এভাবে হেরাক্লিটাস থেকে জেনোফেন, জেনোফেন থেকে পিথাগোরাস, পিথাগোরাস থেকে পার্মেনিডিস, পার্মেনিডিস থেকে জেনো, জেনো থেকে ইমপেডোক্লিস, ইমপেডোক্লিস থেকে এনাক্সাগোরাস, এবং এনাক্সাগোরাস থেকে লুসিপাস-এ এসে আমরা জানলাম– মহাবিশ্ব তৈরি হয়েছে পরমাণু দিয়ে। লুসিপাস বললেন, সবকিছুই অবিভাজ্য ছোট ছোট কণা দ্বারা গঠিত। ডেমোক্রিটাসও বললেন, হ্যাঁ, চারপাশে যা কিছু দেখি, তার সবই পরমাণু ও শূন্যস্থান।

জ্ঞান ও সত্য সন্ধানের এই যে নিরবচ্ছিন্ন ও ধারাবাহিক প্রচেষ্টা, নির্ভীক সংগ্রাম, যা পর্যবেক্ষণ ও যুক্তিতর্কের মধ্য দিয়ে থ্যালিস থেকে এসে পৌঁছোলো ডেমোক্রিটাস পর্যন্ত, এটিই দর্শন। থ্যালিসদের কর্মকাণ্ডকে ২০২২ সালে এসে খুব তুচ্ছ মনে হতে পারে, কিন্তু মানুষের যা রেকর্ডেড

ইতিহাস, তাতে থ্যালিসদের ওই ক্ষুদ্র প্রশ্নটি, অর্থাৎ 'আমরা যা দেখি, তা কী দিয়ে তৈরি?'– এটি থ্যালিসদের আগে আর কারও মনে এমন তীব্র শক্তিতে উদয় হয় নি। সবাই যখন দেব-দেবী নিয়ে ব্যস্ত ছিলো, নিঃশর্ত সমর্পণ ছাড়া আর কোনো ভাবনা যখন কারও মাথায় ছিলো না, তখন প্রাচীন গ্রীসে হঠাৎ একদল মানুষ দেখা দিলো, যারা হুট করে চারপাশের সবকিছু নিয়ে প্রশ্ন করা শুরু করলো– এটি এক মহাবিস্ময়কর ঘটনা। কী দরকার ছিলো প্রশ্ন করার? কীসের তাড়না তাদেরকে উস্কে দিয়েছিলো জ্ঞান ও সত্যের তালাশের দিকে? কেন জেনোফেন একদিন বলে বসলেন, দেব-দেবীর উপাসনা অর্থহীন, এদের আচরণ অযৌক্তিক, ঘোড়ার যদি হাত থাকতো, তাহলে সে ঘোড়ার মতোই দেখতে একটি দেবতার ছবি আঁকতো? সম্ভবত তাঁদের ভেতর জন্ম নিয়েছিলো হঠাৎ এমন কোনো বোধ, যা স্থির ধর্মীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে পায়ে মাড়িয়ে উঁকি দিয়েছিলো মুক্ত আকাশে। এ বোধ, এ কৌতূহলই দর্শন, যা প্রাচীন মিশরীয় ও ব্যাবিলনীয়দের ছিলো না। গণিত, লেক্সিকোগ্রাফি, ও জ্যোতির্বিদ্যায় অসাধারণ দক্ষতা থাকার পরও, শতকের পর শতক ধরে ধর্মতন্ত্রে স্থির থাকায় কোনো গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক চিন্তা মিশর ও ব্যাবিলনে ছড়াতে পারে নি। কারণ ধর্মতন্ত্রে নিয়ম হলো– গতকালের সত্যই আজকের সত্য। কোনো নতুন সত্য উদ্ভাবনের সুযোগ ধর্মতন্ত্রে নেই। গতকাল কেউ সূর্যের পূজা করলে, আজকেও তাকে সূর্যের পূজাই করতে হবে– এই ছিলো মিশর ও ব্যাবিলনের নিয়ম। এ নিয়ম ভাঙার সাহস কেউ করে নি। কিন্তু গ্রিক মাইলেসিয়ানরা এ নিয়ম ভেঙেছিলো। একটি ছোট প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে তারা সূচনা করেছিলো মানব ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধিবিপ্লবটির, যেটির নাম দিয়েছি আমরা দর্শন।

৫.

দর্শন ধারণা দেয়, আর বিজ্ঞান সে-ধারণাকে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা স্থিরতা দান করে। আইনস্টাইন যখন বললেন, আলো খুব ভারী বস্তুর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বাঁকা পথ অনুসরণ করে, সোজা পথ অনুসরণ করে না, তখন তা ছিলো দর্শন। কিন্তু এডিংটন যখন পর্যবেক্ষণযোগে প্রমাণ করলেন যে– আলো সত্যি সত্যিই সূর্যের মতো ভারী বস্তুর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়

বেঁকে যায়, ইউক্লেডীয় সরল জ্যামিতিক পথ সে অনুসরণ করে না, অনুসরণ করে স্থান-কালের বক্র জিওডেসিক পথ, তখন তা হয়ে গেলো বিজ্ঞান। অর্থাৎ কোনো জ্ঞান বা ধারণা যতোক্ষণ পর্যন্ত অনিশ্চিত, ততোক্ষণ পর্যন্ত তা দর্শন। কিন্তু যখনই এটি কানজেকচার বা স্পেকুলেশন থেকে পরিণত হয় নিশ্চিত জ্ঞানে, তখনই সেটি রূপ ধারণ করে বিজ্ঞানের। হিগস কণা একসময় দার্শনিক স্পেকুলেশনের অংশ হলেও, ২০১২ সালের পর তা পরিণত হয়েছে প্রমাণিত বা প্রচলিত সত্যে। কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন, সবার ক্ষেত্রেই এমনটি ঘটেছে। তবে দর্শন কেবল 'ন্যাচারাল ফিলোসোফি' বা 'বিজ্ঞান-উৎপাদক দর্শন'-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ন্যাচারাল ফিলোসোফি দর্শনবৃক্ষের অনেক ডালপালার একটি বড় শাখা মাত্র।

৬.

দর্শনের ব্যাপ্তি তাহলে কী? দর্শন কী নিয়ে কাজ করে?

দর্শন 'সবকিছু' নিয়েই কাজ করে। কোনো প্রাণী তার চারপাশকে কীভাবে দেখছে ও শুনছে, বাস্তবতাকে সে কী প্রক্রিয়ায় অনুভব ও অনুধাবন করছে, কোনো বিষয়ে মানুষ কী উপায়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, সমাজে মানুষের আচরণ কেমন হওয়া উচিত, রাষ্ট্রের সাথে নাগরিকের সম্পর্ক কী, কোনো আর্গুমেন্টের বৈধতা কী উপায়ে নির্ধারিত হয়, পদার্থ ও শক্তির অস্তিত্ব আছে কি না, সময়ের সাথে স্থানের সম্পর্ক কী, মহাবিশ্বের আসল রূপ কেমন, গণিত ও জ্যামিতির ভিত্তি কী, ঈশ্বর আছেন কি না, থাকলে কতোজন আছেন ও তাদের কাজ কী, আইন কখন বৈধ ও অবৈধ হয়, শিক্ষা মানুষের কী কী উপকার ও সর্বনাশ করে, মন কী, ভাষা কীভাবে কাজ করে, বৈজ্ঞানিক সত্যের সীমাবদ্ধতা আছে কি না, ধর্মের ভিত্তি কী, মানুষের জ্ঞান অর্জনের ক্ষমতা কতোখানি, রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজ কী, সত্য-মিথ্যা কী রূপে নির্ধারিত হয়, ভালো-মন্দের ধারণা কীভাবে তৈরি হয়, জীবনের মানে খোঁজা উচিত কি না, কোন অপরাধে কতোখানি শাস্তি দেয়া দরকার, মানুষকে শাসন করার উপযুক্ত কৌশল কোনটি, এ সমস্ত কিছুই দর্শনের কর্মক্ষেত্র। দর্শন সবকিছুকেই পথ দেখায়। আবার কোথাও পথ না

থাকলে সেটিও দেখায়। মহাবিশ্বের প্রতিটি বিষয় নিয়েই সে প্রশ্ন তোলার ক্ষমতা রাখে। প্রশ্নহীন গুরু-শিষ্যবাদ ও পীর-ফকিরি প্রথার স্থান দর্শনে নেই।

ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের মতোই দর্শনে দেখা দিয়েছে নানা সমাজভিত্তিক বৈচিত্র্য। পৃথিবীর একেক অঞ্চলে মানুষ একেক সময়ে অবতারণা করেছে একেক দর্শনের। প্রাচীন গ্রীস ও চীনের মানুষের চিন্তাপদ্ধতির সাথে প্রাচীন ভারতের মানুষের চিন্তাপদ্ধতি মিলবে না। আরব অঞ্চলের মানুষ যে-প্রক্রিয়ায় চিন্তা করেছে, আফ্রিকা অঞ্চলের মানুষ সে-প্রক্রিয়ায় চিন্তা করে নি। আমি যে-প্রক্রিয়ায় চিন্তা করছি, তার সাথে মধ্যযুগ ও আঠারো শতকের ইউরোপীয় দার্শনিকদের চিন্তাপদ্ধতি মেলালে চলবে না। চিন্তার এ বৈচিত্র্য দর্শনে সব স্থানে সব কালেই ছিলো। এটি অনিবার্য। ভাষা ও সভ্যতার মতোই এটি মানুষ দ্বারা নির্মিত হয়েছে।

৭.

দর্শনের কোনো ব্যবহারিক উপযোগিতা নেই, দর্শন এখন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে– এরকম একটি ভুঁইফোঁড় ধারণা বাংলাদেশে প্রচলিত আছে। শুধু বাংলাদেশ নয়, ইউরোপ-আমেরিকার সমাজেও এমনটি লক্ষ করেছি। এর প্রধান কারণ, মানুষ আগের চেয়ে অনেক বেশি চিন্তাবিমুখ ও রুজগারসর্বস্ব জীবন-যাপন করছে। প্রশ্ন করতে ইচ্ছুক, অথোরিটি ও প্রতিষ্ঠিত মতামতকে চ্যালেঞ্জ জানাতে সক্ষম, এমন মানুষের সংখ্যা পৃথিবীতে আশংকাজনকভাবে কমে গেছে। ভোগ-বিলাস ও বিজ্ঞাপন, এ দুটিই মানুষকে বেশি নিয়ন্ত্রণ করছে। বিজ্ঞাপন যা বলছে, মানুষ তাতেই বিশ্বাস স্থাপন করছে। বিজ্ঞাপন যদি বলে, তুমি এই এই বিষয়ে পড়ো, ওই ওই ডিসিপ্লিনে পড়লে পাশ করে ভালো টাকা পাবে, তাহলে মানুষ দলবেঁধে এ বিষয়গুলিই পড়ছে। অনিশ্চিতকে তারা ভয় পাচ্ছে। অথচ পৃথিবীতে যা কিছু মহৎ, তার সবই অনিশ্চিত কর্মকাণ্ডের ফসল। নিশ্চিতের হাত ধরে মহত্ত্ব আসে না।

কৃষি ও শিল্প বিপ্লবের পর পৃথিবীতে চাকার-বাকার খুব বেড়ে গেছে। প্রযুক্তি বিপ্লবের পর মানুষ আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে আলস্য ও আরামপ্রিয়তায়। কাজ করার চেয়ে কাজের তদারকি করতেই তারা অধিক পছন্দ করছে। এ প্রবণতা সমাজে সৃষ্টি করেছে সঞ্চয় ও স্বচ্ছলতার প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগী মানুষ ভাবুক হয় না। কোনো বিষয় নিয়ে গভীরভাবে ভাববে, প্রশ্ন করবে, উত্তর খুঁজবে, এ অবসর প্রতিযোগী মানুষের নেই। তাদের পড়াশোনা সিলেবাসকেন্দ্রিক, অর্থাৎ রাষ্ট্র দ্বারা নির্দেশিত। কেউ সিলেবাস পাশ করেছে, এর অর্থ হলো– লোকটি রাষ্ট্রের ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। রাষ্ট্রের অংশ হওয়ার জন্য মানুষ কতোটা মরিয়া, তা কয়েকটি দেশের সিভিল ও মিলিটারি সার্ভিস পরীক্ষার দিকে তাকালে টের পাওয়া যায়। মরিয়া মানুষের কাছে উঁচু মানের চিন্তা ও প্রশ্ন আশা করা ঠিক নয়। স্যাপিয়েন্সরা এতোই অর্থমুখী যে, একটি নিম্নমানের প্রশ্নও তাদের মাথা থেকে আর নিঃসৃত হচ্ছে না। বাংলাদেশ ও ভারতের রাজনীতির দিকে তাকালে এটি স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। মানুষ দশকের পর দশক ধরে বিনা প্রশ্নে অন্যের আনুগত্য মেনে নিচ্ছে। খারাপ শাসনকে ভাবছে ভালো শাসন। সাংস্কৃতিক আনুগত্যের বেলায়ও এটি সত্য। ধর্মগুরুদেরকে অন্ধের মতো অনুসরণ করা হচ্ছে। ফলে ভারতবর্ষে দর্শন যে একটি অনাকাঙ্ক্ষিত উপদ্রব ও অবহেলিত তৃণলতা হিশেবে বিবেচিত হবে, এ অনুমান আমার আছে।

৮.

দর্শনের প্রতি একটি বৈশ্বিক অবহেলার ছাপ বিজ্ঞানের অগ্রগতির দিকে তাকালেও টের পাই। 'বিগ আইডিয়া' বলে যে একটি ব্যাপার ছিলো, তা বিজ্ঞান থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে। বিজ্ঞান ক্রমশই ব্যয়বহুল ল্যাবরেটরি, প্রযুক্তিসর্বস্ব অনুসন্ধান, পার্টিকল কলাইডার, দল ও প্রজেক্টভিত্তিক গবেষণা, জটিল গণিত, জিন বিশ্লেষণ, সামরিক প্রকল্প, ডলার খরচ, এসবে বন্দী হয়ে পড়ছে। কারণ রেভুলিউশোনারি ধারণা উৎপাদনের জন্য যে-নির্বিঘ্ন ভাবুক মন থাকা দরকার, তা বিজ্ঞান পড়ুয়া ছাত্রদের আর নেই। তারা একটি তাড়াহুড়োর মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। তাড়াহুড়ো করে শিক্ষালাভ করা যায়, কিন্তু জ্ঞানের সন্ধান করা যায় না। আমি বলছি না যে সবাইকে জ্ঞান সন্ধান

করতে হবে, বরং অধিকাংশ মানুষই নিয়ম-মাফিক শিক্ষালাভ করে সাধারণ জীবন যাপন করবেন, এটিই কাম্য, কিন্তু কোনো সমাজে ভাবুক মানুষের সংখ্যা একেবারে শূন্যে নেমে আসাটা ভালো লক্ষণ নয়।

৯.

বেতনভুক্ত বিজ্ঞানীর সংখ্যা এই মুহূর্তে আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি। রাষ্ট্রীয় ও পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থে তারা রাতদিন ভাড়া খাটছেন। গবেষণায় অর্গানাইজেশোনাল প্রেসক্রিপশন অনুসৃত হচ্ছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের একটি ইনস্টিটিউশোনালাইজেশন বা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ঘটে গেছে, এবং এ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, আমার ধারণা, কাঙ্ক্ষিত ও স্বাভাবিক মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। বিজ্ঞান এখন বিজ্ঞানীদের সম্পত্তি, না কি রাষ্ট্রনেতা ও এলন মাস্কদের সম্পত্তি, তা বলা মুশকিল। গবেষণাগারগুলো অধিকাংশই মিলিটারি জেনারেলদের স্বপ্ন পূরণে ব্যস্ত। এর অনিবার্য পরিণতি– কোনো 'বিগ আইডিয়া'-র দেখা আমরা পাচ্ছি না। কারণ বিজ্ঞানের ছাত্ররা দিন দিন দর্শন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। তারা পাকস্থলীর তাড়া ও পুঁজিবাদের ফাঁদে পড়ে নির্দিষ্ট ছক অনুযায়ী বিজ্ঞান গবেষণা করছে। আমি লক্ষ করেছি, এসব গবেষণার বড় অংশই কর্পোরেট ও রাজনীতিক স্বার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রোডাক্ট বা পণ্য তৈরির দিকে তাদের যে-মনোযোগ, সে-মনোযোগ সত্য ও সমাধান খোঁজার দিকে দেখতে পাই না। হ্যাঁ, গুরুত্বপূর্ণ কল্যাণকর গবেষণাও অনেক হচ্ছে, এটি সত্য, কিন্তু বিজ্ঞানীরা যেন রাষ্ট্রনেতা ও সিইওদের রাজনীতিক-অর্থনীতিক উচ্চাভিলাষের ঘুঁটি না হন, এ জন্যই কথাগুলো বলা।

বিজ্ঞানের কর্তারা যদি দার্শনিক অনুসন্ধান বা ফিলোসোফিক্যাল ইনভেস্টিগেশন ছাড়াই গবেষণার ফলাফল মানব সমাজে প্রয়োগ করতে চায়, বা বিজ্ঞানকে ক্যাপিটালাইজেশন ও মিলিটারাইজেশনের টুল হিশেবে ব্যবহার করতে শুরু করে, তাহলে মানুষ বিপদে পড়ে যাবে। মানব সভ্যতা ইতোমধ্যে অতিরিক্ত পণ্য ও অপ্রয়োজনীয় অস্ত্রের ভারে পর্যুদস্ত। পারমাণবিক যুদ্ধের ঝুঁকি দিন দিন বাড়ছে। ডেসপোটিক সরকারগুলো 'বুদ্ধিমান প্রযুক্তি' ব্যবহার করে নাগরিকদের ব্যক্তিগত জীবন লণ্ডভণ্ড করে

দিচ্ছে। সমাজে প্রাইভেট সিটিজেন আছে, কিন্তু কোনো প্রাইভ্যাসি নেই। রাষ্ট্র যখন-তখন আড়ি পাতছে। ফলে ভীতিকর হয়ে উঠছে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী। কেউ কেউ ধর্মের সাথে কুজ্ঞান মিশিয়ে তৈরি করছে অভিনব প্রোপাগান্ডা মেশিন। এ অবস্থায় বিজ্ঞানের ছাত্রদের দর্শনবিমুখতায় আমি উদ্বিগ্ন।

১০.

দর্শনের প্রতি এই অবহেলা সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি, আইন, অর্থনীতি, গণিত, সাহিত্য, প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতেও লক্ষ করা যায়। আইনের ছাত্ররা মন দিয়ে জুরিসপ্রুডেন্স পড়ছে না। কেউ কেউ শুধু পরীক্ষা পাশের লক্ষ্যে হার্ট-অস্টিন ঘাঁটছে। বিচারপতিরা আইনের দর্শন আমলে না নিয়েই লেজিস্লেশন ইন্টারপ্রিট করছেন। সাহিত্যের জনপ্রিয় মাছগুলি ব্যস্ত রয়েছে পুনরাবৃত্তিমূলক কবিতা, পানসে অপন্যাস, দালালি কলাম, ও উইকিপিডিক প্রবন্ধ উৎপাদনে। দর্শন থেকে দূরে থাকায় তারা গভীর ও শক্তিশালী কোনো সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারছে না। সাংবাদিকরা ক্ষমতাধরদের সামনে গিয়ে ঘাইঘুই করছেন। বুদ্ধিজীবীদের কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হচ্ছে বিড়ালের রণসঙ্গীত। অর্থনীতিওয়ালাদের বেলায়ও এ কথা সত্য। দর্শনবিমুখ হওয়ায় তারা কেবলই তত্ত্বমুখস্থকারী হাফেজ হিশেবে আবির্ভূত হচ্ছেন। হাফেজে ইকোনোমিক্স। লক্ষ করেছি, জনগণের সাথে নয়, ব্যাংক ও মন্ত্রীদের সাথেই তাদের সখ্য বেশি। ফলে অবধারিতভাবে, তারা যখন রাষ্ট্রের জন্য অর্থনীতিক পলিসি তৈরি করেন, তখন সেটি নাগরিকদের চেয়ে ব্যাংক ও সরকারের স্বার্থকেই বেশি সুরক্ষা দেয়। কিন্তু এ হাফেজরা যদি অর্থনীতির পাশাপাশি দর্শনও পড়তেন, দার্শনিকদের মতো সৎভাবে চিন্তা করা শিখতেন, তাহলে এমনটি ঘটতো না।

বাংলাদেশের রাজামণ্ডলীর কথা বলাই বাহুল্য। দর্শন দূরের কথা, সাধারণ পড়াশোনাটুকুও তারা করেন না। গণতন্ত্রের সাথে ক্ষমতার সম্পর্কের ব্যাপারে তারা অবগত নন। অধিকাংশ মন্ত্রী-এমপির দার্শনিক জ্ঞান এতো প্রগাঢ় যে, তাদের কারও সাথেই পাঁচ মিনিট জন লক বা জেফারসোনিয়ান ডেমোক্র্যাসি নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। মমতাজ নামের

এক সংসদ সদস্য দাবি করেছেন– তিনি বুখারি, তিরমিযি, মুসলিম, প্রভৃতি নানা শরীফ অসংখ্যবার পাঠ করেছেন। আইন প্রণয়নের জন্য এসব বই নিশ্চয়ই বেন্তামের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। হবসের 'লেভাইয়াথান' বা রাসেলের 'পাওয়ার' পড়া এমপি আমাদের সংসদে এই মুহূর্তে কতোজন আছেন, তার একটি পরিসংখ্যান পেলে ভালো হতো।

১২.

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দিকে তাকালে দেখি, গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রশ্নগুলো নিয়ে ছাত্র-শিক্ষক কেউই মাথা ঘামাচ্ছে না। কোনো বিষয়েই তারা কৌতূহলী নয়। বরং ভুল করে কেউ কৌতূহলী হয়ে উঠলে তাকে নানাভাবে অপদস্ত করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, 'তুমি তো বেশি বোঝো'। অর্থাৎ বেশি বোঝা এখানে আপত্তিকর ব্যাপার। স্বাভাবিক ও গ্রহণযোগ্য ব্যাপার হলো– কম বোঝা। সবচেয়ে ভালো হয় কিছুই না বুঝলে। তাহলে নাগরিকদের নিয়ে রাষ্ট্রকে আর কোনো দুশ্চিন্তা করতে হয় না। কারণ রাজার জন্য প্রশ্নবিমুখ নির্বাক ভোটারই সবচেয়ে নিরাপদ প্রজা।

আমাদের অভিভাবকত্বের মানও ভালো নয়। শিশুদেরকে এখানে বড়দের সাথে কথা বলতে নিষেধ করা হয়। সন্তানকে একটি তারকা ও গ্রহের জীবনচক্র বুঝিয়ে বলতে সক্ষম, এরকম বাবা-মার সংখ্যা এ সমাজে হাতেগোনা। ভোটপ্রার্থী কোনো ইউনিয়ন চেয়ারম্যানকে হঠাৎ রাস্তায় ধরে যদি শিশুরা জিগ্যেস করে, 'ভোটাভুটি জিনিসটির উৎপত্তি হলো কীভাবে? এর সুবিধা ও অসুবিধা কী?'– তাহলে তিনি বিপদে পড়ে যাবেন। অর্থাৎ এ অঞ্চলে বড়দের কাছে শিশুদের শেখার মতো খুব বেশি কিছু নেই। শিশুদের ফিলোসোফিক্যাল ডেভেলপমেন্ট ঘটার জন্য যে-পরিবেশ দরকার, তা বাংলাদেশ তৈরি করতে পারে নি। প্রাইমারি ইশকুলগুলো হয়ে উঠেছে হতাশ, নিষ্প্রাণ, ও অকেজো স্নাতকদের পুনর্বাসন কেন্দ্র। একের সাথে এক যোগ করলে দুই হয়, এটি এখানে সব ছাত্রই জানে; কিন্তু কেন দুই হয়, বা এভাবে এক সংখ্যার সাথে আরেক সংখ্যা যোগ করলে সবসময় যোগফল সঠিক আসবে কি না, এটি কোনো শিক্ষার্থী জানে না। যদি

তাদেরকে গণিতের সাথে কিছুটা গাণিতিক দর্শনও পড়ানো হতো, তাহলে হয়তো জানতো।

আমি কিছু মানুষকে এ প্রশ্নটি করেছি– পাঁচের সাথে পাঁচ যোগ করলে দশ হয়, এটি আপনারা কীভাবে নিশ্চিত হয়েছেন? তারা প্রশ্নটি শুনে খুব অবাক হয়েছে। বিজ্ঞানের ছাত্রদের সাথে কয়েক মিনিট কথা বললে বুঝা যায়, তারা বিজ্ঞানের দার্শনিক ভিত্তিগুলো সম্পর্কে কিছুই জানে না। ফিলোসোফি অব সায়েন্সের সাথে তাদের পরিচয় নেই। কেউ কেউ স্নাতকোত্তর ক্লাসে গিয়ে পপার, ফলসিফায়েবিলিটি, এসব পড়ছে। অথচ এগুলো থাকার কথা ছিলো অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ে। কোনো এক্সপেরিমেন্ট থেকে যে-ডাটা পাওয়া যায়, তা কতোটুকু নির্ভরযোগ্য; এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্স বা পর্যবেক্ষণমূলক বিজ্ঞানের সাথে পার্সেপশনের সম্পর্ক কী, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল পর্যবেক্ষণকারীর অনুধাবন-ক্ষমতা দ্বারা কীভাবে প্রভাবিত হয়– এসব তাদেরকে পড়ানো হচ্ছে না। পদার্থবিজ্ঞানের কোনো স্নাতককে যদি বলা হয়, পদার্থের অস্তিত্ব নেই, তাহলে সে খেপে উঠবে। কারণ দর্শন না পড়ার কারণে সে পদার্থের স্বাধীন অস্তিত্বকে শতোভাগ নিশ্চিত ব্যাপার ধরে নিয়েছে। ফলে ধর্মের মতো বিজ্ঞানও কিছু ক্ষেত্রে ডগমাটিক হয়ে উঠছে। একজন মনোথিস্ট ধার্মিককে যদি বলা হয়, ঈশ্বর নেই, তাহলে সে যে-প্রতিক্রিয়া দেখাবে, একজন পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষকও এখন একই প্রতিক্রিয়া দেখাবে, যদি তাকে বলা হয়– ম্যাটার ডাজ নট এক্সিস্ট; আমরা যা দেখি ও অনুভব করি, তা সবই 'আইডিয়া' বা মনের গণ্ডগোল। পদার্থবিজ্ঞানের কিছু স্নাতকের সাথে আমি কথা বলে দেখেছি, তারা সময়, স্থান, তাপ, এ বিষয়গুলোর ব্যাপারে গভীর ও স্পষ্ট ধারণা রাখে না। এমন কি পদার্থ ও শক্তি, এ দুটি বিষয় নিয়েও তাদের ধারণা ভাসা ভাসা। কারণ এ গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলো মেটাফিজিক্স বা দর্শনের সৃষ্টি, এবং দর্শন তারা পড়তে চায় না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ছাত্ররা এখানে মৌলিক কৌতূহলগুলো নিবৃত্ত না করেই স্নাতক পাশ করছে।

মেডিক্যাল কলেজগুলোর অবস্থা আরও শোচনীয়। কিছুদিন আগে চিকিৎসাবিদ্যার ছাত্রদের কাছে মেডিক্যাল-শিক্ষার মান ও অবস্থা নিয়ে মতামত আহ্বান করেছিলাম। শতো শতো ছাত্রের মতামতে যে-চিত্র পেয়েছি, তা সুখকর নয়। কলেজগুলোতে চিকিৎসাবিদ্যা কেমন পড়ানো হয়– তা আলোচনা করা এখানে প্রাসঙ্গিক মনে করছি না, কিন্তু দর্শনের কোনো স্থান যে ওখানে নেই, তা উল্লেখ করা জরুরি। অনেকেরই দাবি, ডাক্তারি পড়ুয়া বহু ছাত্র থিওসোফিস্টের মতো আচরণ করে। চিকিৎসাবিদ্যা একটি ধর্মীয় আবিষ্কার, ধর্ম মেনে চললে রোগ-বালাই হয় না, এমন মনোভাব ছাত্র-শিক্ষক দুই দলের মাঝেই প্রকট। মোরাল ফিলোসোফি বা এথিক্স, এবং ফিলোসোফি অব মেডিসিন, এ দুটি অপরিহার্য বিষয়ের কোনো পাঠ না নিয়েই তারা কর্মজীবন শুরু করে। অল্প কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, নির্দিষ্ট টেকনিক্যাল ডিসিপ্লিনের বাইরে চিকিৎসকরা অন্য বিষয়ে পড়াশোনাও করতে চান না। সাহিত্যকে নাকি খুব নিরুৎসাহিত করা হয়। এটি উদ্বেগজনক। কারণ এতে মানবিক মনের মৃত্যুর ঝুঁকি তৈরি হয়।

১৪.

ধর্মপ্রচারক ও ধর্মীয় শ্রোতারা এখানে দর্শনকে ভয়ের চোখে দেখে। অনেকের ধারণা, দর্শন পড়লে ঈমান চলে যাবে। পড়লে ঈমান চলে যাবে, আর না পড়লে ঈমান থাকবে, এটি খুব কৌতূহলোদ্দীপক প্রচারণা। এ ধরনের কাল্পনিক পাঠভীতি ধর্মের জন্য ভালো নয়। এই মুহূর্তে মুসলিম সমাজে থিওলোজির চেয়ে ওয়াজনৈপুণ্যের কদর বেশি। অগাস্টিন বা গাজ্জালির মতো থিওলোজিস্ট, যারা ধর্মকে একটি দার্শনিক ভিত্তি দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন, সেরকম কেউ মুসলিম বিশ্বে এখন নেই। চারদিকে হুঙ্কারবাদী মাওলানাদের জয়জয়কার। আবু রুশদ বা ইবনে সিনার চাইতে জাকির নায়েকের মতো বাকপটু নির্বোধগণ মুসলিমদের কাছে অধিক জনপ্রিয়। চাপাবাদের আক্রমণে বুদ্ধিবাদ চলে গেছে নির্বাসনে। চিন্তাবাদকে চড়-থাপ্পড় মেরে বিদায় করেছে শক্তিবাদ।

দর্শন মানুষকে চিন্তা করতে শেখায়। 'কী ও কীভাবে'– এ দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নকে সুসংহত ও ধারালো করতে দর্শনের বিকল্প নেই। র‍্যাশোনাল থট বা যুক্তিনির্ভর চিন্তা, এটি গণমানুষের জন্য ভাতের চেয়েও জরুরি বিষয়। কোনো সমাজে মানুষ যদি স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে না শেখে, তাহলে গণতন্ত্র সেখানে সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোও তখন জনগণের পক্ষে থাকে না। কারণ গণতন্ত্র মূলত বুদ্ধিমান ও যুক্তিবাদী মানুষের সমাজে ক্রিয়াশীল। বেকুব, গোঁয়ার, ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের জন্য গণতন্ত্র উপযুক্ত শাসন-ব্যবস্থা নয়। এ কারণে মাতৃভাষায় দর্শনের কিছু মৌলিক পাঠ ইশকুলের সিলেবাসে রাখা দরকার। রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপকগণ এটি চাইবে না, কারণ তারা জানে ইশকুলের সিলেবাসে দর্শন থাকলে কী কী বিপদ ঘটতে পারে; কিন্তু জনগণকে তা চাইতে হবে। অন্যথায় রাষ্ট্রের মালিকদের চেয়ে রাষ্ট্রের কর্মচারীরা সবসময়ই ক্ষমতা চর্চায় এগিয়ে থাকবে।

১৫.

একের সাথে এক যোগ করলে কীভাবে দুই হয়, বা তিনের সাথে তিন যোগ করলে কীভাবে ছয় হয়, তা কিছু কৌতূহলী পাঠক জানতে চাইতে পারেন। এ জন্য গাণিতিক দর্শনের এই কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়টি এখানে সহজ ভাষায় উল্লেখ করছি।

ধরা যাক আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে ৩ + ৩ = ৬

এখানে মোট চার প্রকার গাণিতিক চিহ্ন আছে। চিহ্নগুলো হলো ৩, +, =, ও ৬, যেখানে ৩ ও ৬ হলো প্রাকৃতিক সংখ্যা বা ন্যাচারাল নাম্বার।

প্রাকৃতিক সংখ্যা কাকে বলে? প্রাকৃতিক সংখ্যা হলো সে-সংখ্যা, যে-সংখ্যা আমরা গণনা বা কাউন্টিংয়ের কাজে ব্যবহার করি।

'=' হলো সমান চিহ্ন, যা দিয়ে বুঝায় 'বাম পাশের রাশিটির মান ডান পাশের রাশিটির সমান'। 'সমান'-এর কিছু সাধারণ ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য আছে।

'+' হলো যোগ চিহ্ন, যা নির্দেশ করে, চিহ্নের আগের রাশিটির সাথে পরের রাশিটি যোগ করে নতুন সংখ্যা বা রাশি তৈরি করা হচ্ছে।

গণিত মূলত লজিক বা যুক্তিবিদ্যা, যার ভিত্তি হলো কিছু সাধারণ সত্য বা এক্সিয়োম। এই এক্সিয়োমগুলোকে বৈধ যুক্তি দ্বারা প্রসারিত করলে যোগ, বিয়োগ, ভাগ, গুণ প্রভৃতি গাণিতিক অপারেশনগুলোর ফলাফল পাওয়া যায়। আমরা এখানে যোসেপ পিয়ানোর এক্সিয়োমগুলো দ্বারা ৩ + ৩ = ৬ প্রমাণের চেষ্টা করবো।

এ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় পিয়ানোর এক্সিয়োম বা সাধারণ সত্যগুলো হলোঃ

১.

শূন্য, অর্থাৎ ০ একটি প্রাকৃতিক সংখ্যা বা ন্যাচারাল নাম্বার।

২.

যেকোনো প্রাকৃতিক সংখ্যা x-এর জন্য $x = x$ সত্য। অর্থাৎ 'সমান' বিষয়টি রিফ্লেক্সিভ। প্রতিটি সংখ্যা বা রাশি তাদের নিজেদের সমান। যেমন ১ = ১, ১৫ = ১৫, $y = y$, ইত্যাদি।

৩.

x ও y যদি দুটি প্রাকৃতিক সংখ্যা হয়, এবং x যদি y-এর সমান হয়, তাহলে y-ও x-এর সমান হবে। অর্থাৎ $x = y$ হলে, $y = x$ হবে। সুতরাং দেখা

যাচ্ছে, 'সমান' বিষয়টি এখানে সিমেট্রিক। কোনো প্রাকৃতিক সংখ্যা বা রাশিকে '=' চিহ্নের ডান ও বাম যেদিকেই নিই না কেন, এতে মানের কোনো গণ্ডগোল বা পরিবর্তন দেখা দেয় না।

৪.

ধরা যাক x, y, ও z তিনটি প্রাকৃতিক সংখ্যা। যদি $x = y$, এবং $y = z$ হয়, তাহলে অবশ্যই $x = z$ হবে। অর্থাৎ ক যদি খ-এর সমান হয়, এবং খ যদি গ-এর সমান হয়, তাহলে অবশ্যই ক-ও গ-এর সমান হবে। ফলে দেখা যাচ্ছে, 'সমান' বিষয়টি এখানে ট্রানজিটিভ। বিশটি সমান সংখ্যা বা রাশি, তারা প্রত্যেকেই একে অপরের সমান।

৫.

প্রতিটি প্রাকৃতিক সংখ্যা n-এর পরবর্তী সংখ্যাও একটি প্রাকৃতিক সংখ্যা। যেমন, 0-এর পরবর্তী সংখ্যা ১, এবং ৫-এর পরবর্তী সংখ্যা ৬। এটিকে সাকসেসোর ফাংশন $S(n)$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। $S(n)$ মানে হলো 'সাকসেসোর অব n' বা 'n-এর উত্তরসূরী' বা 'n-এর পরবর্তী সংখ্যা'। অর্থাৎ $S(1)$ দ্বারা বুঝায় ১-এর পরবর্তী সংখ্যা 2-কে, $S(2)$ দ্বারা বুঝায় 2-এর পরবর্তী সংখ্যা 3-কে। এভাবে $S(3) = 4$, $S(4) = 5$, $S(5) = 6$

৬.

কোনো প্রাকৃতিক সংখ্যারই পরবর্তী সংখ্যা 0 হতে পারবে না। অর্থাৎ $S(n)$ কখনোই 0-এর সমান নয়। আরও স্পষ্ট করে বললে, প্রাকৃতিক সংখ্যা 0 হতে শুরু হবে। যেমন 0, 1, 2, 3..... এভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে।

৭.

দুটি প্রাকৃতিক সংখ্যা m ও n সমান হবে, যদি এবং কেবল যদি m ও n এর সাকসেসোর বা পরবর্তী সংখ্যাগুলোও সমান হয়। অর্থাৎ $m = n$ হবে, যদি $S(m) = S(n)$ হয়।

৮.

ধরা যাক a ও b দুটি সংখ্যা। তাহলে:

(ক) a-এর সাথে 0 যোগ করলে যোগফল সবসময় a হবে। অর্থাৎ $a + 0 = a$ হবে।

(খ) a-এর সাথে b-এর পরবর্তী সংখ্যা যোগ করলে যে-যোগফল পাওয়া যাবে, তা a ও b দুটি সংখ্যার যোগফলের পরবর্তী সংখ্যার সমান হবে। অর্থাৎ $a + S(b) = S(a+b)$ হবে। ৫ নম্বর এক্সিয়োমটি আবার পড়ুন, তাহলেই বুঝা যাবে যে S(b) হলো b-এর পরবর্তী সংখ্যা, এবং S(a+b) হলো a ও b-এর যোগফলের পরবর্তী সংখ্যা।

এবার দেখা যাক আমরা $3 + 3 = 6$ প্রমাণ করতে কি না।

3 + 3, এটিকে উপরের এক্সিয়োমগুলোর ভিত্তিতে লেখা যায়:

$3 + 3 = 3 + S(2)$ ------------------- [৫ নম্বর এক্সিয়োম অনুসারে ৩ হলো দুই এর সাকসেসোর বা পরবর্তী সংখ্যা, অর্থাৎ S(২)]

আবার এক্সিয়োম নম্বর ৮(খ) অনুসারে $3 + S(2) = S(3+2)$

একইভাবে, $S(3+2) = S\{(3+S(1)\} = S\{S(3+1)\} = S[S\{3+S(0)\}] = S[S\{S(3+0)\}]$

কিন্তু এক্সিয়োম নম্বর ৮(ক) অনুসারে $3 + 0 = 3$

অর্থাৎ $S[S\{S(3+0)\}] = S[S\{S(3)\}] = S\{S(4)\} = S(5) = 6$ ------------------- [৫ নম্বর এক্সিয়োম অনুসারে]

সুতরাং গণিতের মৌলিক লজিক্যাল ভিত্তি প্রয়োগ করে আমরা দেখতে পেলাম যে, ৩ + ৩ = ৬ হয়। এভাবে ১ + ১ = ২, ২ + ২ = ৪, ইত্যাদিও প্রমাণ করা যাবে।

যেমন $2 + 2 = 2 + S(1) = S(2+1) = S\{2+S(0)\} = S\{S(2+0)\} = S\{S(2)\} = S(3) = 4$

কেন একের সাথে এক যোগ করলে দুই হয়, এ প্রশ্নটি প্রথম মাথায় এসেছিলো ইশকুলে পড়ার সময়। শিক্ষকদের কেউই প্রশ্নটির সদুত্তর দিতে পারেন নি। সবাই বলেছেন, একের সাথে এক যোগ করলে তো দুই-ই হবে, এটি দিবালোকের মতো স্পষ্ট। এটিকে প্রমাণ করার কিছু নেই।

গণিতের ভিত্তি কী, গণিত কীসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, গাণিতিক অপারেশনগুলো কীভাবে নির্ধারিত হয়েছে, এ মৌলিক প্রশ্নগুলো আমাকে খুব পীড়া দিতো। পীড়া নিয়ে পরীক্ষা পাশ করা যায়, কিন্তু কৌতূহল নিবৃত্ত করা যায় না। ইশকুল পেরিয়ে যখন কলেজে গেলাম, তখনও শিক্ষকদের কাছে এসব প্রশ্নের উত্তর পাই নি; যদিও এলজেব্রা, ক্যালকুলাস, ট্রিগোনোমিট্রি, জ্যামিতি, এ বিষয়গুলোতে নিয়মিত ১০০% নম্বর পেয়ে চলছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা ছিলো আরও করুণ। সেখানে প্রশ্ন করারও সুযোগ ছিলো না। কেউ প্রশ্ন করলে তাকে উপহাস করা হতো। জ্ঞান বিতরণে শিক্ষকরা ছিলেন অত্যন্ত নিরস, পানসে, ও ব্যর্থ। ফটোকপি, নোট, প্রজেক্টর, ঘড়ঘড়ঘড়ঘড়, এই ছিলো বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানকাণ্ড।

তবে প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে পেয়েছিলাম, যখন বার্ট্রান্ড রাসেলের 'প্রিন্সিপিয়া ম্যাথম্যাটিকা' বইটি পড়া শুরু করি। সেখানে রাসেল প্রায় হাজার পৃষ্ঠা ব্যয় করে প্রমাণ করেছিলেন– দুইয়ের সাথে দুই যোগ করলে চার হয়।

পাদটীকা : উপরে সরলতা ও বোধগম্যতার স্বার্থে আমি যোসেপ পিয়ানোর এক্সিয়োমগুলো ব্যবহার করেছি। সরকারের উচিত হবে, এসব বিষয়কে হাই ইশকুলের গণিত বইয়ে স্থান দেওয়া।

পশু নয়, ফলমূল

২০২২ সালে প্রথম আমি ফলমুল দিয়ে কুরবানি আদায়ের প্রস্তাব করি। তারপর এ নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে চলেছে তুমুল তর্ক। অনেক মুসলিমই জানতে চেয়েছেন, ফলমূল দিয়ে কুরবানি আদায় করলে তা আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে কি না? পশু জবাই বাদ দিলে আল্লাহ রাগ করবেন কি না? এর উত্তরে বলবো, কেবল ধর্মীয় বৃত্ত থেকে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি পছন্দ করি না। কারণ এতে আলোচনার সার্বজনীনতা নষ্ট হয়। কিন্তু গুরুত্ব বিবেচনায়, কুরবানির ধর্মীয়, রাজনীতিক, ও দার্শনিক– তিনটি দিকই আজ আলোচনা করবো।

১.

মুসলিমদের ধারণা, কুরবানি একটি ইসলামী প্রথা। আর কোনো ধর্মে বুঝি কুরবানি নেই। এটি সঠিক নয়। কুরবানিকে এক্সক্লুসিভলি ইসলামী রিচুয়াল বলার সুযোগ নেই। আরবি, ফার্সি, ও উর্দু শব্দ পেলেই সেটিকে ইসলামী জিনিস ভাবার বাতিক আমাদের আছে। এ বাতিক থেকেই হজ্ব, নামাজ, গজল, কুরবানি, এগুলোকে মুসলিমরা ইসলামী আচার ভাবে। অথচ কুরবানি শব্দটির সেমাইটিক অরিজিন রয়েছে। এটি এসেছে আরবি 'কুর্ব' থেকে, যার অর্থ ঘনিষ্ঠতা বা নৈকট্য। যে-কাজের মাধ্যমে আল্লাহ বা ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠতা লাভ করা যায়, তা-ই কুরবানি। কাজটি যে সবসময় পশু জবাই হতে হবে, এমন নয়। পশু জবাই ছাড়াও নানা উপায়ে মানুষ ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে পারে। কিন্তু বঙ্গভাষায় 'কুরবানি' শব্দটি

এমনভাবে বিবর্তিত হয়েছে, যেন এর মূল অর্থ 'পশু জবাই'। দীর্ঘদিনের অভ্যাসের ফলে মানুষ 'জবাই' শব্দটিকে কুরবানির সাথে গুলিয়ে ফেলেছে। ফলে সমাজে ধারণা জন্মেছে, জবাই ছাড়া বুঝি কুরবানি হবে না। ইহুদী, খ্রিস্টান, ইসলাম– তিনটি ধর্মের মানুষই এ মনোভাব নিয়ে কুরবানি আদায় করছে। এ জন্য ফলমূল কুরবানির কথা শুনে তারা আঁতকে উঠছে। ভাবছে, ঈদের দিন বুঝি ছুরি লাগাতে হবে কোনো আঙুর বা আপেলের গলায়।

কোরানে যে-আয়াতের মাধ্যমে কুরবানিকে মুসলিমদের নিকট পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছে, সেটি এরকম:

"ওয়াতলু আলাইহিম নাবা আবনাই আদামা বিলহাক; ইজ কাররাবা কোরবানান ফাতুকুব্বিলা মিন আহাদিহিমা ওয়া লাম ইয়ুতাকাব্বাল মিনাল আ'খারি কা'লা লা আকতুলান্নাকা কা'লা ইন্নামা ইয়াতাকাব্বালুল লা'হু মিনাল মুত্তাকিন।"

আয়াতটিতে নবী আদমের দুই পুত্রের গল্প বলা হয়েছে। দুই পুত্রই আল্লাহর দরবারে কিছু একটা কুরবানি করেছিলেন। তবে এক পুত্রের কুরবানি কবুল হলেও আরেক পুত্রেরটা কবুল হয় নি। কারণ আল্লাহ কেবল মুত্তাকি বা ভালো মানুষের কুরবানিই গ্রহণ করেন। আদমের এক পুত্র মুত্তাকি হলেও আরেক পুত্র মুত্তাকি ছিলেন না।

আয়াতটির ব্যাখ্যায় ইবনে কাসির লিখেছেন– আদমপুত্র হাবিল একটি ভেড়া, ও কাবিল কিছু শস্যদানা বা ফলমূল কোরবানি দিয়েছিলেন। কিন্তু কাবিল মুত্তাকি না হওয়ায় তার কোরবানি কবুল হয় নি। কাবিল ছিলেন হিংসুটে। তার অন্তরে তাকওয়া ছিলো না। তিনি কাজকর্মে আল্লাহর উপস্থিতি অনুভব করতেন না।

এ আয়াতে যে "কা'লা লা আকতুলান্নাকা" কথাটি আছে, সেটিতে কাবিল হাবিলকে প্রকাশ্যে হত্যার হুমকি দিয়েছেন। বলেছেন– "আমি তোকে মেরে ফেলবো"। কাউকে হত্যার হুমকি দেয়া কোনো ভালো মানুষ বা

মুত্তাকির কাজ নয়। যার অন্তরে তাকওয়া আছে, যিনি কাজকর্মে আল্লাহর উপস্থিতি অনুভব করেন, তার দ্বারা কারও ক্ষতি সাধন অসম্ভব।

কিন্তু হাবিল মুত্তাকি ছিলেন (ইসলামী মোরালিটি অনুযায়ী), এবং এ ইঙ্গিত উপরের আয়াতের ঠিক পরের আয়াতে আছে। কাবিলের হুমকির জবাবে হাবিল বলেছিলেনঃ

"লা'ইম বাসাত্তা ইলাইহা ইয়াদাকা লিতাকতুলানি মা'আ আনা বিবা'সিতিনি ইয়াদিয়া ইলাইকা লি আকতুলাকা ইন্নী আখা'ফুল লা'হা রাব্বুল আ'লামীন।"

অর্থাৎ, তুমি যদি আমার গায়ে হত্যার উদ্দেশ্যে হাত তুলো, তাহলে ভেবো না যে আমিও তোমার গায়ে হত্যার উদ্দেশ্যে হাত তুলবো। কারণ আমি আল্লাহকে 'ভয়' পাই। তোমার জঘন্য কাজের বিপরীতে আমাকেও জঘন্য কাজ করতে হবে, এমনটি আমি মনে করি না।

আবু আলা-মাউদুদির তাফসিরেও একই বক্তব্য রয়েছে। তিনি লিখেছেন, কাবিলের কোরবানি কবুল হয় নি, এর কারণ এই নয় যে তার কুরবানিতে সমস্য ছিলো। বরং তিনি মুত্তাকি বা ভালো মানুষ ছিলেন না বলেই কুরবানি কবুল হয় নি।

এখান থেকে স্পষ্ট হয় যে, আপনি 'কী জিনিস' কুরবানি দিচ্ছেন, তা গুরুত্বপূর্ণ নয়; গুরুত্বপূর্ণ হলো– আপনি 'ভালো মন' নিয়ে কুরবানি দিচ্ছেন কি না, তা। কাবিল যদি মুত্তাকি অবস্থায় কুরবানি দিতেন, তাহলে তার কুরবানি গৃহীত হতো। তিনি ফলমূল দিলেন নাকি ভেড়া দিলেন, তা নিয়ে আল্লাহ মাথা ঘামাতেন না। এটিই কোরানের বক্তব্য। কিন্তু মুসলিম বিশ্বে কী ঘটছে? তারা পশু জবাইকেই কুরবানির একমাত্র মাধ্যম বলে প্রচার করছে। পশু জবাই ছাড়াও যে কুরবানি আদায় হতে পারে, এটি তারা ভাবতে পারছে না।

২.

কুরবানি ইসলামের ফরজ বিধানও নয়। এটি সুন্নত। করলে ভালো, না করলেও ক্ষতি নেই। মুসলিম হওয়ার জন্য কুরবানি কোনো শর্ত নয়। অথচ প্রথাটিকে সমাজে এমনভাবে চাপানো হয়েছে, যেন ঋণ করে হলেও কুরবানি দিতে হবে। যিনি টাকার অভাবে স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট বানাতে পারছেন না, অর্থাভাবে সন্তানকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাতে যিনি হিমশিম খাচ্ছেন, তিনিও লোক-লজ্জায় কুরবানি দিচ্ছেন। সমাজে মুখ দেখানোর প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছেন। যাকাত ফরজ বিধান হলেও যাকাতের চেয়ে কুরবানিতে মুসলমানদের অধিক আগ্রহ। আমি এতে আপত্তি করছি না, উৎসব আমার ভালোই লাগে, কিন্তু কোনো উৎসব কেবল পশু জবাইয়ের মাধ্যমেই পালন করা যাবে– এমন মনোভাব আপত্তিকর। আমি চাই, মুসলিমরা পশু কুরবানির পাশাপাশি ফলমূল, শস্যদানা, দুধ, বস্ত্র, ওষুধ, বই, এসবও কুরবানির দিক। আর আমি তো পশু কুরবানিতে নিষেধাজ্ঞা দিচ্ছি না, কারণ আর্টিফিশিয়াল মিট বা ল্যাব-গ্রোন মাংস এখনো সহজলভ্য হয় নি।

সবাই পশু কাটাকাটি করছে, এটি কোনো সুন্দর দৃশ্য নয়। উৎসবে বৈচিত্র্য থাকতে হয়। উৎসব একঘেয়ে হয়ে উঠলে তা আর উৎসব থাকে না। মাংসের সাথে ফলমূলের উপস্থিতি নিশ্চিত করা গেলে ঈদে নতুন আমেজ আসবে। গরিবদের মাঝে মাংস বিতরণ, এমন দোহাই দিয়ে যারা পশু কুরবানিতে অটল থাকতে চান, তাদেরকে বলবো– গরিব মানুষ মাংস খেতে পায় না, এ কথা যেমন সত্য, তেমনি গরিব মানুষ ফলমূল খেতে পায় না, সে-কথাও সত্য। শুধু মাংস খাওয়া স্বাস্থ্যসম্মত কাজ নয়। বাংলাদেশে এতো কোষ্ঠকাঠিন্যের রোগী কেন? কারণ এরা প্রোটিন খেলে শুধু প্রোটিন খায়। শর্করা খেলে কেবল শর্করা। আর কোনো খাবার খেতে চায় না। মাংসের সাথে আঁশ ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট-সমৃদ্ধ ফলমূল খাওয়া যে জরুরি, এটি মাংসলোভীরা জানে না।

গরিব মানুষ মাংস খেতে পারে না, এমন চিত্রের পেছনেও কুরবানির ঈদ দায়ী। কারণ বাংলাদেশে ঈদ ছাড়া কেউ পশু বিক্রি করতে চায় না। পশুপালনের যে-শিল্পায়ন এ দেশে ঘটেছে, তা ঈদকেন্দ্রিক। প্রতিটি ভালো

গরু, ভালো ছাগল, ভালো ভেড়া মানুষ জমিয়ে রাখে ঈদে বিক্রি করার জন্যে। ফলে উৎপাদিত মাংসের সিংহভাগই বাজারে আসে না। সব মাংস আসে ঈদের দিনে। একদিনে এতো মাংস উৎপাদন অর্থহীন। টেলিভিশনে দেখলাম, এক লোক, ঢাকায় পঞ্চাশ লাখ টাকা দিয়ে পনেরোটি গরু কিনেছে, এবং আরও গরু কেনার জন্য বাজারে ঘুরছে। এসব গরু যদি সারাবছর বাজারে বিক্রি হতো, তাহলে আমার মনে হয় না মাংসের এতো দাম থাকতো। গরিব মানুষ তখন সুলভে মাংস খেতে পারতো। সমাজের একটি অংশকে ৩৬৫ দিন মাংসবঞ্চিত রেখে একদিন মাংসের বন্যায় ভাসিয়ে দিয়ে কী উপকার হয়, তা বুঝতে পাগল হতে হবে। গরিবদের ঘরে রেফ্রিজারেটরও নেই। সারাদিন মাংস সংগ্রহ করার পর তারা উপায় খোঁজে, কীভাবে তা ভালো দামে বিক্রি করা যায়। শুনেছি কসাইরা ফকির ভাড়া করে মাংস সংগ্রহ করাচ্ছেন!

৩.

অনেকে বলেন, নবী কি ফলমূল দিয়ে কুরবানি আদায় করেছেন? যদি না করে থাকেন, তাহলে আমরা কেন করবো? ভাবখানা এমন যে, নবী যা করেন নি, তা বাংলার ধর্মসৈনিকরা করেন না। নবী ছবি তুলেন নি, ফেসবুক চালান নি, ভিডিও দেখেন নি, কাঁঠাল খান নি, জাম্বুরা খান নি, এন্টিবায়োটিক নেন নি, তাই ধর্মসৈনিকরাও এসব থেকে বিরত থাকছেন! কথা হলো, নবী যে-সময়ের মানুষ, সে-সময়ে আরবে খাওয়ার মতো খুব বেশি কিছু ছিলো না। ফলের মধ্যে ছিলো খেজুর, শস্যের মধ্যে ছিলো গম, যব, ভুট্টা। মাংসের মধ্যে ছিলো ভেড়া ও ছাগল। ফলে স্বাভাবিকভাবেই, তখন আরবদের উৎসবেও ছিলো এসবের প্রাধান্য। আমি কুরবানি-বিষয়ক হাদিসগুলো বিশ্লেষণ করে দেখেছি, সেগুলোতে 'কুরবান' শব্দটির বদলে 'উযিয়া' ও 'জাবিহা' শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দগুলো 'পশু জবাই' এবং 'কোরবানির অংশ হিশেবে পশু জবাই'– এ দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। সাধারণভাবে 'কুরবানি' অর্থে নয়। কারণ 'কুরবানি' দ্বারা 'কেবল পশু জবাই' বুঝায় না। ফলমূল বা শস্যদানা উৎসর্গ করাও বোঝায়। কোরানে 'কুরবান' শব্দটি এমন অর্থেই এসেছে।

কোরানে কোথাও বলা হয় নি– "কেবলমাত্র পশু জবাই করে কোরবানি আদায় করা যাবে" বা "ফলমূল ও শস্যদানা দিয়ে কোরবানি আদায় করা যাবে না।" নির্ভরযোগ্য কোনো হাদিসেও এরকম নির্দেশনা নেই। কুরবানিতে পশুর ব্যবহার অধিক হয়েছে, বা 'পশু কুরবানি' অধিক প্রচলিত, এর বড় কারণ– পশু একপ্রকার বিলাসী পণ্য। লাক্সারি আইটেম। এর দাম বেশি। উৎসব ও অতিথি আপ্যায়নে পশুমাংসের কদর রয়েছে। মাংস ঐতিহাসিকভাবেই ধনী ও প্রভাবশালীদের খাবার। ফলে সারাবছর খেজুর ও রুটি খাওয়া আরবরা ঈদে ভেড়া কুরবানি করতে চাইবে, এটিই স্বাভাবিক। কিন্তু বর্তমান বিশ্ব এমন নয়। প্রতিটি দেশে গবাদি পশুর ম্যাস-ডোমিস্টিকেশন ঘটেছে। যেদিকে চোখ যায় শুধু ফার্ম-ক্যাটল। পোল্ট্রি শিল্পের বিকাশ ঘটেছে অভাবনীয় গতিতে। মাছ তো ভাতের মতোই সহজলভ্য। ফলে বলা যায়, প্রাণিজ আমিষ এখন আর কোনো বিলাসবহুল খাবার নয়। খাসি, গরু, মুরগী, মাছ, টার্কি, যে যা পারছে খাচ্ছে। আমার মনে হয় না, নবী মুহাম্মদ বেঁচে থাকলে এখন ছাগল ও গরু কুরবানি দেয়াকে উৎসাহিত করতেন।

নবী কখনো বলেন নি, আমি যা যা করেছি, তোমাদেরকে কেবল তা-ই করতে হবে। নবী তো ভেড়া কুরবানি দিতেন, বাঙালি মুসলমান কি ভেড়া কুরবানি দেয়? দেয় না। বরং ভেড়া কুরবানি দেয়াকে তারা গরিবির আলামত মনে করে। আমি শৈশবে দেখেছি, যারা ভেড়া কুরবানি দিতেন, তাদের দিকে গরু-কুরবানিওয়ালারা করুণার দৃষ্টিতে তাকাতো। নবী কি মিথ্যে কথা বলতেন? গালাগালি করতেন? মনে হয় না। কিন্তু যারা নবীর সৈনিক সেজেছেন, অভিনয় করছেন সুন্নতের কাণ্ডারির চরিত্রে, তারা নিয়মিত মিথ্যে কথা বলছেন। ভিন্নমতের ওপর গালির ভ্যানগাড়ি নিয়ে চড়াও হচ্ছেন। ছেলে হয়েও ফেসবুকে মেয়ের ছবি টাঙ্গিয়ে রাখছেন। লুঙ্গি পরা আব্দুল কুদ্দুস রূপ ধারণ করছে বোরকা পরা সুমাইয়ার। এই হলো অবস্থা। যদি এরা কোরান পড়তো, কোরান বুঝতো, মুত্তাকি হতো, তাহলে ফলমূল কুরবানির মতো উপকারী প্রস্তাবের প্রতি এমন বুনো প্রতিক্রিয়া দেখাতো না। ফিকহ শাস্ত্রের একটি প্রতিষ্ঠিত নিয়ম হলো, কোনো বিষয় যদি কোরান দ্বারা বৈধ হয়, তাহলে সেটিকে হাদিস দ্বারা অবৈধ ঘোষণা করা যাবে না। কোনো হাদিস কোরানের আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক হলে, সে-হাদিস বাতিল ও বানোয়াট বলে গণ্য হবে। যেখানে কোরান কাউকে

কুরবানি দিতে বাধ্য করে নি, কুরবানিকে ফরজ বলে আখ্যায়িত করে নি, সেখানে ধার্মিকরূপী সমাজসেনারা কুরবানিকে করে তুলেছে অলজ্ঘনীয় রীতি। কোরান বলছে, পশু ও ফলমূল উভয়টি দিয়েই কুরবানি আদায় করা যাবে। কিন্তু সমাজসেনারা বলছে, না, কুরবানি অবশ্যই গরু দিয়ে আদায় করতে হবে! হাবভাবে দেখে মনে হচ্ছে– আল্লাহ এদের প্রভু নন, বরং এরাই আল্লাহর প্রভু। না হলে আল্লাহর বাণীর উপরে মোল্লার বাণীকে এভাবে স্থান দিতো না।

যাইহোক, এগুলো ধর্মীয় আলোচনা, এবং ধর্মীয় আলোচনার কোনো শেষ নেই। চাইলে আরও পাঁচ-দশটি আয়াত এখানে উল্লেখ করতে পারি, এবং নহর, মানসাকান, হজ্ব, রক্ত, ইসমাইল, দুম্বা, আদমের শরিয়ত, ইব্রাহিমের শরিয়ত, এগুলো নিয়ে বাকবিতণ্ডা সৃষ্টি করতে পারি। দেখাতে পারি যে, কোনো আয়াতেই ফলমূল কুরবানির প্রথা রহিত করা হয় নি, এবং বাধ্যতামূলক করা হয় নি পশু কুরবানির বিধান। কিন্তু এতে লাভ কী? এতে কি তারা চোখ মেলে তাকাবে, যারা নিজেদের চোখ নিজেরাই সেলাই করে রেখেছে? মূর্খকে জ্ঞান দেয়া যায়, কিন্তু মূর্খ হয়েও যিনি জ্ঞানীর ভান করেন, তাকে জ্ঞান দেয়া যায় না।

৪.

এবার আসা যাক কুরবানির রাজনীতিক দিকটিতে। পশু কুরবানি মানুষের অর্থনীতিক ক্ষমতার স্মারক বহন করে। গণতন্ত্র যেখানে দুর্বল, সেখানে অর্থনীতিক ক্ষমতাই রাজনীতিক ক্ষমতার মূল চালিকাশক্তি। বাংলাদেশে যে-আবহাওয়া বিরাজ করছে, তাতে মনে হয় না কুরবানি একটি ধর্মীয় প্রথা। বরং কুরবানির মাধ্যমে কীভাবে অর্থনীতিক ক্ষমতার প্রচার চালানো যায়, সেটিই কুরবানিওয়ালাদের মূল লক্ষ্য। ফলে তৈরি হচ্ছে প্রতিযোগিতা। সামাজিক প্রতিযোগিতার একটি ধর্ম হলো– এটি শ্রেণী-সংক্রামক। কোনো নির্দিষ্ট অর্থনীতিক শ্রেণীতে এ প্রতিযোগিতা সীমাবদ্ধ থাকতে চায় না। কারণ ধনীর আচার, একসময় হয়ে ওঠে গরিবেরও আচার। পশু কুরবানি ঐতিহাসিকভাবেই বিত্তবানদের আচার। যিনি পশু কুরবানি দেন, তার অর্থনীতিক ক্ষমতা, যিনি পশু কুরবানি দেন না, তার

চেয়ে বেশি– এমন মনস্তাত্ত্বিক প্রচারণা সমাজে আছে। যেহেতু ধন-সম্পদের সাথে সামাজিক মর্যাদার সমানুপাতিক সম্পর্ক, তাই গরিব মানুষরাও চায় ধনী হয়ে বা ধনী হওয়ার ভান করে সামাজিক মর্যাদা আদায় করতে। এ কারণে অনেক গরিব, ধনীর চরিত্রে অভিনয়ের অংশ হিশেবে পশু কুরবানি দিচ্ছেন। মধ্যবিত্তরা তো যেকোনো মূল্যে বজায় রাখতে চাইছে সামাজিক মর্যাদা। কারণ কুরবানি না দিলে সমাজে রটে যাবে– লোকটির টাকা-পয়সা কম, তার দিন কাটছে অভাব অনটনে। মেয়েদেরকে শ্বশুরবাড়িতে জিগ্যেস করা হচ্ছে, তোমার বাবা কী কুরবানি দিয়েছে? এ ধরনের প্রশ্ন মেয়েদের জন্য বিব্রতকর। সব মেয়েই চায়, বাবার মুখটি শ্বশুরবাড়িতে উজ্জ্বল থাকুক। বাবারাও এটি বোঝেন। এ জন্য মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হলেও তিনি কুরবানি দেন। যিনি ভাগে বা শরিক হয়ে কুরবানি দিলে পারতেন, তিনি ধান বিক্রি করে, ধার-কর্জ করে, কিনে আনেন আস্ত গরু। কারণ মানুষ টের পেয়েছে, একা একটি গরু কুরবানি দেয়ার যে-সামাজিক মর্যাদা, তা সাত জনের শরিকানা কুরবানির চেয়ে বেশি। ঈদের দিন যে-প্রশ্নগুলো শোনা যায়, সেগুলো থেকেও এটি অনুমান করা যায়। গরু কতো টাকা দিয়ে কিনেছেন? কয়টি গরু কুরবানি দিয়েছেন? কুরবানি একা দিয়েছেন নাকি ভাগে দিয়েছেন? এই হলো কুরবানির বিসিএস প্রিলি।

আমি বলছি না যে সবাই প্রশ্নগুলো ভিন্ন মতলবে করে, কিন্তু প্রশ্নকর্তাদের একটি বড় অংশই যে কুরবানিদাতার আর্থিক সক্ষমতা যাচাই করতে প্রশ্নটি ছোঁড়ে, তা অস্বীকার করা যাবে না। আমার পাশের গ্রামে দুই পরিবারে খুব রেষারেষি ছিলো। এক ঈদে, প্রথম পরিবার একটি গরু কিনে আনার পর দ্বিতীয় পরিবার দুইটি গরু কিনে আনে। সেটি দেখে প্রথম পরিবার কিনে আনে আরও তিনটি গরু, এবং এনে লুকিয়ে রাখে এক আত্মীয়ের বাড়িতে। ঈদের দিন প্রথম পরিবারের কর্তা যখন দুইটি গরু জবাই করে বীরদর্পে হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন, তখন খবর আসে যে দ্বিতীয় পরিবার জবাই করছে চারটি গরু! ব্যস, সংবাদ শুনে প্রথম পরিবারের কর্তা ঘোষণা দেন– ঈদের তিন দিন পর্যন্ত কুরবানি আদায় করা যায়; আগামীকাল ইনশাল্লা আরও কয়েকটি গরু জবাই করবো। এই হলো আল্লাহর নৈকট্য লাভের বঙ্গদেশীয় প্রদর্শনী। অর্থাৎ কুরবানি এখানে 'দেখিয়ে দেওয়া'-র উপলক্ষ হিশেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

অনেকে বলবেন, "এতে ক্ষতি কী? ধনী মানুষ প্রতিযোগিতা করে বেশি গরু কুরবানি দিলে গরিব মানুষেরই লাভ!" এগুলো মাথামোটা চিন্তা। সম্পদ ধনীর হাত থেকে গরিবের হাতে গেলে অর্থপ্রবাহ তৈরি হয়, এ কথা সত্য, কিন্তু কুরবানির মাংস সমাজে কোনো কার্যকর অর্থপ্রবাহ তৈরি করে না। এটি পচনশীল দ্রব্য, এবং অকারণে অধিক মাংস খাওয়া শরীরের জন্য ভালো নয়। আমি লক্ষ করেছি, এ দেশে মানুষ মাংসের জন্য হাহাকার করে রমজান মাসে। কিন্তু চড়া দামের কারণে ওই সময় তারা মাংস খেতে পারে না। এ জন্য প্রস্তাব করেছিলাম, সব পশু ঈদুল আযহায় কুরবানি না দিয়ে, কিছু পশু রোজার মাসে, এবং কিছু পশু ঈদের পর কুরবানি দিতে। এর নাম রেখেছিলাম আমি 'আগাম কুরবানি' ও 'সাসপেন্ডেড কুরবানি'। অর্থাৎ কোরবানির ঈদে একসঙ্গে এতো গরু কোরবানি না দিয়ে কোরবানিকে আমি ৩৬৫ দিনে স্প্রেড করে দিতে বলেছি। এতে গরিব মানুষ সারা বছর মাংস খেতে পারবে। মাংসের দামও বাজারে কম থাকবে। কেবল জিলহজ্ব মাসের ১০, ১১, ও ১২ তারিখে কোরবানি দিতে হবে, এমন নিয়ম সমাজবান্ধব নয়। একজন মুসলিম তার কোরবানিকে বছরের যেকোনো দিনের জন্য 'সাসপেন্ড' করে রাখতে পারেন। যিনি ঈদুল আযহায় বিশটি গরু কুরবানি দিচ্ছেন, তিনি যদি একটি গরু ওই দিনের জন্য রেখে উনিশটি গরু রমজান মাসে কুরবানি দিতেন, তাহলে গরিব মানুষ উপকৃত হতো। এ প্রক্রিয়ায় 'বেস্ট ইউজ অব রিসোর্স' নিশ্চিত হতো।

কিন্তু তা না করে মাংসের বন্যা লাগানো হচ্ছে ঈদুল আযহায়। কারণ এতে রাজনীতি আছে। প্রতিবেশীকে দেখিয়ে দেওয়ার আনন্দ আছে। ধনী মানুষদের একটি ইনস্টিঙ্কটিভ আচরণ হলো– তারা সবসময় গরিব দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতে চায়। কোনো উপলক্ষে কেউ এসে তাদের কাছে মুখ কাঁচুমাচু করে কিছু চাইবে, এটি তারা কামনা করে। এতে অল্ট্রুইজমের সুখ তো আছেই, ক্ষমতা চর্চার সুখও আছে। পুকুরে মাছের খাবার ছিটানোর সময় যে-দৃশ্য তৈরি হয়, সেরকম দৃশ্য মানবসমাজে তৈরি করা গেলে, তা খুব উপভোগ্য ব্যাপার হয়। ধনীরা নানা উপায়ে এ ধরনের ক্রীড়াকর্ম সৃষ্টি করেন, এবং আয়েশ করে উপভোগ করেন। পশু কুরবানিও একধরনের ক্রীড়া। রিলিজাস স্পোর্টস। এ স্পোর্টস ধনী কর্তৃক গরিবের ওপর রাজনীতিক প্রভাব বিস্তারে সাহায্য করে। রাজনীতিক ক্ষমতার প্রধান খাদ্য

‘সিগন্যাচার অব ওয়েলদ’। পশু কুরবানি মানুষের সম্পদের সামাজিক স্বাক্ষর বহন করে।

৫.

কুরবানির রাজনীতির একটি বড় অংশ হলো ইকোনোমিক পলিটিক্স, বা অর্থনীতিক রাজনীতি। কুরবানিকে কেন্দ্র করে বিপুল পরিমাণ রেফ্রিজারেটর কেনাবেচা হয়। এ কেনাবেচা বাড়াতে বাজারে আসছে নতুন নতুন ফতোয়া। একটি ফতোয়া এরকম: “কুরবানির মাংস তিন ভাগ করা জরুরি নয়। চাইলে পুরো মাংসই ঘরে রেখে দেয়া যাবে।” একসময় ধনীরা কুরবানির পশু গরিব কৃষকদের কাছ থেকে কিনতো। কিন্তু এ চিত্র বদলে গেছে। গরু লালন-পালনের কাজ এখন আর কৃষকদের দখলে নেই। এ ব্যবসায় ঢুকে পড়েছেন পুঁজিপতিরা। মন্ত্রী-এমপিরা হলফনামায় বলছেন– ‘আমি গরুর ব্যবসা করি।’ দিকে দিকে মাথা তুলছে দৃষ্টিনন্দন গবাদি খামার। কৃশকায় গাভী ও বলদের স্থান দখল করছে পশ্চাতপুষ্ট ষাঁড়। এসব ষাঁড় ঈদ ছাড়া আর কোনো মৌসুমে বিক্রি করা হচ্ছে না। ষাঁড়গুলো গ্রাস-ফেড নয়। ঘাসের চেয়ে দানাদার খাবারই বেশি খাওয়ানো হচ্ছে। চারণভূমির অভাবে এগুলোকে লালন-পালন করা হচ্ছে বন্দী কয়েদির মতো। বলা যায়, ক্যাটল ফার্মিংয়ের একটি নীরব শিল্পায়ন এ দেশে ঘটে গেছে। চিটাগুড় ও ভুসির মতো পশুখাদ্য এখন কৃষকদের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। বাণিজ্যিক খামারের চাপে হু হু করে বাড়ছে ক্যাটল ফিডের দাম। দেশি-বিদেশী নানা কোম্পানি এ খাতে বিনিয়োগ করছে। গরুপতিরা কি চাইবে, মানুষ পশুর বদলে ফলমূল কুরবানি দিক? চাইবে না। কোনো পশুর হাটে গিয়ে যদি বলি, ভাইয়েরা আমার, কুরবানির জন্য গরু জবাই অপরিহার্য নয়, ফলমূল দিয়েও কুরবানি আদায় করা যায়, তাহলে সাধারণ মুসলিমরা ক্ষেপে না উঠলেও ক্ষেপে উঠবে গরু ব্যবসায়ীরা। কারণ ধর্মীয় আবেগকে অনেকেই এ অঞ্চলে ব্যবসার মূলধন বানিয়েছে।

৬.

এবার দেখা যাক কুরবানির দার্শনিক দিকটি। যিনি মিল্কিওয়ে ডিজাইন করলেন, ফিউশনের মাধ্যমে কসমিক অন্ধকারে আলোর ব্যবস্থা করলেন, তার দরকার গরু-ছাগলের রক্ত– এমন কল্পনা দার্শনিকদের জন্য অসুবিধাজনক। ঈশ্বর ধারণার বিবর্তনের দিকে তাকালে দেখতে পাবো, পৃথিবীর সব অঞ্চল একই ঈশ্বর দ্বারা শাসিত নয়। এক এলাকার ঈশ্বরের সাথে আরেক এলাকার ঈশ্বর মেলে না। তবে একটি জায়গায় ঈশ্বরদের মিল আছে। তারা প্রায় সবাই উপাসনা পছন্দ করেন। মানুষ তাদেরকে খুশি রাখতে চায়। এ খুশি রাখার প্রবণতা থেকেই উদ্ভব ঘটেছে কুরবানি বা পশুবলি প্রথার। পশুবলি একপ্রকার ঘুষ। ডিভাইন ব্রাইবারি। খারাপ রাষ্ট্রগুলোতে মানুষ যে-প্রক্রিয়ায় সরকারি কর্মচারীদের খুশি রাখে, উৎকোচ দিয়ে কার্যসিদ্ধি করে, সে-একই প্রক্রিয়ায় পশুবলির মাধ্যমে মানুষ ঈশ্বরকে খুশি রাখতে চায়। এর অর্থ কী দাঁড়ালো? ঈশ্বরের চরিত্র ভালো নয়, তিনি ঘুষের লোভে মানুষকে ভয় দেখান, ঘুষ না দিলে প্রার্থনা কবুল করবেন না, বিপদ-আপদ দেবেন, এই তো? মানুষ স্বার্থপর প্রাণী। এ জন্য সে ঈশ্বরকেও কল্পনা করেছে কোনো স্বার্থপর সত্তা রূপে । মানুষ 'কুড প্রো কো' প্রথায় বিশ্বাসী বলে ভেবেছে, ঈশ্বরও বুঝি এমনই। ইউনিয়নের চেয়্যারম্যান, থানার দারোগা, তাদেরকে মাছ-মাংস উপহার দেয়া জাতি যে ঈশ্বরকেও ডিসি বা এসপি ভাববে, তা অস্বাভাবিক নয়। অর্থাৎ মানুষ ঈশ্বরকে মানুষ হিশেবেই কল্পনা করেছে। আবেগপ্রবণ নবীরা ভেবেছে ঈশ্বরও আবেগপ্রবণ। মানুষ ঘুষখোর, তাই তার ধারণা ঈশ্বরও ঘুষখোর। মানুষ দুর্বলের কাছে ভালোবাসার প্রমাণ চায়, তাই সে রটিয়েছে– ঈশ্বরও বান্দাদের কাছে ভালোবাসার প্রমাণ চান। মানুষ পামপট্টি, চাটুকারিতা, তোষামোদি পছন্দ করে, তাই সে এসব গুণাবলী ঈশ্বরের কাঁধেও চাপিয়েছে। মানুষ উপহার, উপঢৌকন, ও যৌতুক পেলে খুশি হয়, তাই সে বিশ্বাস করে– ঈশ্বরও এগুলো দেখলে খুশি হন। এসব পেলে ঈশ্বরের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো থাকবে। অর্থাৎ ঈশ্বরের অনুগ্রহ পেতে হলে দিতে হবে বলি বা কুরবানি।

উদাহরণ হিশেবে অ্যাজটেকদের কথা বলা যায়। অ্যাজটেকদের এক ঈশ্বর ছিলেন, নাম হুইটজিলোপটলি। পটলির বাবা-মা-ও ঈশ্বর ছিলেন। একজনের নাম টোনাকেটচুটলি, আরেকজনের নাম টোনাকাসিওয়াটল। টোনাকেটচুটলি ছিলেন জন্মদানের ঈশ্বর। টোনাকেটচুটলির ঘরে মানুষ যখন সূর্য ও যুদ্ধের ঈশ্বর হুইটজিলোপটলিকে জন্ম দিলো, তখন দেখা গেলো, হুইটজিলোপটলি সারাক্ষণ অন্ধকারের সাথে যুদ্ধ করছেন। এ যুদ্ধে তিনি হারলে পৃথিবীকে অন্ধকার গ্রাস করে ফেলবে, এবং সূর্যের মৃত্যু ঘটবে। আর সূর্যের মৃত্যু ঘটলে, মানুষেরও মৃত্যু হবে। মানুষ তো মৃত্যু চায় না। মৃত্যু তার কাছে ভীতিকর। সে কল্পনা করলো, হুইটজিলোপটলি যেন অন্ধকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারে, এ জন্য তাঁর গায়ে শক্তি জোগান দিতে হবে।

ঈশ্বরেরও গা আছে, এবং এ গায়ে মানুষকে পৃথিবী থেকে দিতে হবে শক্তির জোগান– এ খুবই চমৎকার কল্পনা! মারামারি করে ঈশ্বরের গায়ের রক্ত যেন না কমে, তাঁর বল যেন অটুট থাকে, এ জন্য অ্যাজটেকরা হুইটজিলোপটলিকে কিছু একটা দেয়ার চিন্তা করলো।

কিন্তু কী দেয়া যায়, এ নিয়ে তারা দ্বিধায় পড়লো। মানুষ বেশিক্ষণ দ্বিধায় থাকে না। সুবোধ অথবা নির্বোধ, কোনো একটা সিদ্ধান্ত সে নিয়ে ফেলে। অ্যাজটেকরাও নিয়েছিলো। তারা দেখলো, গরু-ছাগল ও পাখি না দিয়ে মানুষ দেয়াই ভালো। মানুষের রক্তের চেয়ে উত্তম রক্ত আর হয় না। গরু-ছাগল তো সবাই দেয়। আমরা দেবো মানুষ। তারা শুরু করলো ঈশ্বরের নামে মানুষ কোরবানি! হাজার হাজার হতভাগ্য মানুষকে এরা ঈশ্বরের খাদ্য বানালো। এক তেনোখতিতলানেই ওরা যে-পরিমাণ মানুষ কোরবানি দিলো, তাদের রক্তের ওপর নৌকো ভাসার কথা। রস হ্যাসিগের মতে, ঈশ্বরের সন্তুষ্টি লাভের আশায় তেনোখতিতলানে দশ থেকে একাশি হাজার মানুষকে কোরবানি দেয়া হয়েছিলো।

অ্যাজটেকদের আরেক ঈশ্বর, নাম তালোক, সে বললো, প্রাপ্তবয়স্ক মানুষে আমার চলবে না। আমার লাগবে শিশু। আমার নামে শিশু কোরবানি দিতে

হবে। অন্যথায় বৃষ্টি দেবো না। কোরবানি দেয়ার সময় শিশুরা যখন কাঁদবে, তাদের চোখ থেকে জল বের হয়ে যখন মাটি স্পর্শ করবে, তখন আমি বৃষ্টি দেবো। আমাকে শিশুর চোখের জল না দিলে আসমান থেকে জল ফেলবো না। বৃষ্টির জন্য কী মহান ঈশ্বর অ্যাজটেকরা সৃষ্টি করেছিলো! একটি শক্তিহীন অসহায় চোখ ছলছল শিশুকে হাত-পা বেঁধে ছুরির নিচে ফেললে, এবং ছুরিটি শিশুর গলায় পোঁচিয়ে পোঁচিয়ে, কুপিয়ে কুপিয়ে, লাল রঙের নদী তৈরি করলে, তিনি বৃষ্টি দেবেন!
বৃষ্টির আশায় কতো শিশুকে যে কোরবানি দেয়া হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। অথচ বৃষ্টি যথা নিয়মেই হয়েছে, বা হয় নি। মাঝখান দিয়ে কল্পিত ঈশ্বরকে খুশি করতে তৈরি করা হয়েছে রক্তনদী। জলের বৃষ্টি নামাতে যে রক্তবৃষ্টির প্রয়োজন নেই, এ বোধ ধর্মান্ধ অ্যাজটেকদের ছিলো না।

৮.

ধর্মান্ধতার জন্ম ভয় থেকে। ধর্মান্ধ মানুষ সারাক্ষণ ভয়ের ভেতর বাস করে। কারণ ভয় কাটানোর মতো পর্যাপ্ত জ্ঞান তার নেই। একটি অজানা আতঙ্ক, অজানা আশঙ্কা, তাকে সর্বদা আড়ষ্ট করে রাখে। সে ভাবে, এই বুঝি আমার ঈশ্বর ক্ষেপে গেলো। এই বুঝি ঈশ্বর রেগে গিয়ে আমার ওপর গজব নাজিল করলো। আতঙ্কিত মানুষ নিষ্ঠুর প্রকৃতির হয়। কারণ ভয় কাটাতে সে যেকোনো নৃশংস কাজ করতে প্রস্তুত থাকে। যে মানুষ যতো বেশি নিষ্ঠুর, সে মানুষের কল্পিত ঈশ্বরও ততো নিষ্ঠুর। মানুষ কতোটা নিষ্ঠুর হলে ঈশ্বরের ভয়ে নিজের সন্তান কোরবানি দিতে পারে, তা ভাবলে আঁতকে উঠতে হয়।

এ প্রসঙ্গে হিব্রু বাইবেলের সাত নম্বর বইয়ের কথা মনে পড়ছে। ওখানে দেখলাম, আমি 'বুক অব জাজেস'-এর কথা বলছি, জেপথা নামে ইসরায়েলীদের এক বিচারক ছিলেন, যিনি সেনাপতি হয়ে অ্যামনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। যুদ্ধে হারার ভয়ে ভদ্রলোক প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যদি যুদ্ধে জয়ী হতে পারি, তাহলে বাড়ি ফিরে যে-প্রাণীটিকে প্রথম সামনে পাবো, তাকে ঈশ্বরের দরবারে কোরবানি করবো। জেপথা হয়তো ভেবেছিলেন, কোনো ছাগল-ভেড়া বা শুয়োর-কুকুর সামনে পড়বে, কিন্তু

বাবার প্রতীক্ষায় যে মেয়ে পথ চেয়ে বসে থাকবে– তা কে জানতো! ধর্মান্ধ বনী ইসরায়েলের নেতা জেপথা নিজের মেয়েকেই কোরবানি করে দিলেন।

এ লাইনটি স্পর্শকাতর, বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় ছাপানো সম্ভব হলো না। ## ঈশ্বর তাঁকে বলেছিলেন, তোমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস আমার দরবারে কোরবানি করো। তিনি ভাবলেন, ## এ লাইনটি স্পর্শকাতর, বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় ছাপানো সম্ভব হলো না ## এতো প্রিয় জিনিস কোরবানি দিলে বিপদ হতে পারে। এ জন্য তিনি ## এ লাইনটি স্পর্শকাতর, বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় ছাপানো সম্ভব হলো না ## ছেলে ইসমাইলকে। ইসমাইলকে নিয়ে ছুটে চললেন মরিয়াহ পর্বতে, এবং ## এ লাইনটি স্পর্শকাতর, বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় ছাপানো সম্ভব হলো না ##। ছুরি চালাতে যাবেন, এমন সময় আকাশ থেকে একটি ভেড়া এসে ## এ লাইনটি স্পর্শকাতর, বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় ছাপানো সম্ভব হলো না ## ইসমাইলের স্থানে শুয়ে পড়লো, এবং ইসমাইল বেঁচে গেলো। ঈশ্বর বললেন, ## এ লাইনটি স্পর্শকাতর, বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় ছাপানো সম্ভব হলো না ##, তুমি পরীক্ষায় পাশ করেছো। তুমি আমার অত্যন্ত অনুগত বান্দা। তোমাকে দিয়ে যেকোনো ## এ লাইনটি স্পর্শকাতর, বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় ছাপানো সম্ভব হলো না ##। তবে ## এ লাইনটি স্পর্শকাতর, বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় ছাপানো সম্ভব হলো না ## কোরবানির সময় আকাশ থেকে ভেড়া নামলেও, অ্যাজটেকদের কোরবানির সময় কেন ভেড়া নামলো না, তা আমার কাছে বোধগম্য নয়। সম্ভবত ইসরায়েল ও মেক্সিকো, এ দুই এলাকা দুই ঈশ্বরের দখলে ছিলো। কিন্তু ওই ভেড়াটি মানুষ কোরবানি বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, এটি অস্বীকার করা যাবে না।

এখন অবশ্য ইসরায়েল ঈশ্বরের চেয়েও শক্তিশালী। পারমাণবিক বোমার খবরে ঈশ্বর ইসরায়েল থেকে পালিয়েছেন। ঈশ্বরের অনুপস্থিতিতে তারা নিয়মিত ফিলিস্তিনে খুন-খারাবি করছে। মেক্সিকোতেও ঈশ্বর আর নেই। শিশু কোরবানি ছাড়াই ওখানে বৃষ্টিপাত হচ্ছে। অন্ধকারের হাতে সূর্যের মৃত্যুর আশঙ্কাও শূন্যে নেমেছে। বায়ান্ন বছর পর পর মহাবিশ্ব ধ্বংস

হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়, এ ভয় মেক্সিকানরা কাটিয়ে উঠেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের আঘাতে হুইটজিলোপটলি আঁধারের সাথে যুদ্ধ করা বন্ধ করে দিয়েছে।

কৃষিতেও মেক্সিকো ভালো করছে। ভুট্টা, আখ, গম, টম্যাটো, কলা, কমলা, এরকম বাহারি ফসল ফলাতে তাদের কোনো কৃষি-ঈশ্বরের প্রয়োজন পড়ছে না। ফল-ফসলের ঈশ্বর শিপা টটেক এখন আর মেক্সিকোতে নেই। তাঁর দরবারে মানুষ কোরবানি না দিয়েই মেক্সিকানরা চমৎকার চাষাবাদ সারছে। ট্রাক্টর, সার, সেচ পাম্প, ট্রান্সপ্লান্টার, হার্ভেস্টার, ও বালাইনাশকের আক্রমণে শিপা টটেক মৃত্যুবরণ করেছেন। মানুষখেকো কাল্পনিক আসমানী ঈশ্বরের সাহায্য ছাড়াই বিশ্বের অর্ধেক এভোকাডো মেক্সিকোতে উৎপন্ন হচ্ছে। কাউকে এক ফোঁটা রক্ত না খাইয়েও মেক্সিানদের গড় আয়ু উন্নীত হয়েছে পঁচাত্তর বছরে।